অর্থনীতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এর দশ দফা

(বাংলা-bengali-البنغالية)

শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

1430هـ - 2009م

islamhouse.com

﴿ عشر مبادئ نبوية للاقتصاد ﴾

(باللغة البنغالية)

شاه محمد حبيب الرحمن

2009 - 1430

islamhouse.com

অর্থনীতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এর দশ দফা

অর্থনীতি সমাজকাঠামো ও রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনার অন্যতম মৌল ভিত্তি। যুগে যুগে বিশ্বের নানা অঞ্চলে যে সব সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। তাদের প্রত্যেকেরই অর্থনৈতিক উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সমসাময়িক যুগে ছিল অবিশ্বাস্য। ঐসব সভ্যতার ক্ষমাতাগর্বী শাসকগোষ্ঠী ও অমাত্যজন আল্লাহ ও তাঁর নবী-রাসূলদের শিক্ষা ভুলে সমাজে যে ভয়াবহ শোষণ ও নির্যাতন নিপীড়ন চালিয়েছে তাও ইতিহাসের অংশ হয়ে রয়েছে। মিসরীয় সভ্যতা, রোমান সভ্যতা শ্রমশোষণ ও বিপুল জনগোষ্ঠীর অধিকার হরণেরও ইতিহাস। কালস্রোতে সেসব সভ্যতা বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু সে সবের প্রভাব ও আচরিত প্রথা বিলুপ্ত হয়নি। ফলে সমাজে অনাচার আর অত্যাচারে সয়লাব বয়ে গেছে। তাই নির্যাতিত মানবতা মুক্তির প্রহর গুনেছে। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছে কবে তাদের অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও হতাশা দূর হবে। শোষণের যাঁতাকল হতে কবে তারা নিষ্কৃতি পাবে?

রাজা বাদশাহ ও জমিদারের বিলাসিতার কড়ি যোগাতে না পারায় অগণিত বনি আদম বন্দীশালার হিমশীতল মেঝেতে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেছে। সুদের নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যাওয়া মানুষ ভিটেমাটি হতে উচ্ছেদ হয়েছে। যুগের পর যুগ নারীরা রয়ে গেছে সম্পত্তির অধিকার বঞ্চিত। ইয়াতীমরা হয়েছে সম্পত্তি হতে বিতাড়িত। সর্বনাশা জুয়ার খপ্পরে পড়ে অগণিত মানুষ হয়েছে সহায় সম্বলহীন। ব্যবসায়িক অসাধুতার কারণে জনসাধারণের জীবনে উঠেছে নাভিশ্বাস আর হারাম উপার্জনের জৌলুসের কাছে পরাস্ত হয়েছে মেহনতী কর্মচারীর পূত পবিত্র অনাড়ম্বর জীবন। অমানিশার এই গাড় অন্ধকার দূর করতে আল-কুরআনের আলোকে বর্তিকা হাতে নিয়ে আজ হতে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন সৃষ্টি জগতের শেষ্ঠ মানুষ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। নবুয়তপূর্ব যুগের চল্লিশ বছরে রাসূলে আকরাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব ঘনিষ্ঠভাবে আরব ভূখন্ডের জনগণের জীবনধারা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সমাজে বিরাজমান শোষণ নির্যাতন তাঁকে গভীরভাবে আন্দোলিত করেছিল। মুক্তির পথ খুঁজতে তিনি তাই হেরা গুহায় নিবিষ্ট মনে চিন্তা করেছেন মাসের পর মাস, বছরের পর বছল। তারপর এক শুভক্ষণে মহান রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ নিয়ে আর্বিভূত হলেন জিবরীল ফেরেশতা। শুরু হলো মানব ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়। মানবতার মুক্তির সনদ এখন রাসূলেরই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতে। কিন্তু তাঁর আহ্বানে সাড়া দেবার পরিবর্তে প্রচন্ড বিরোধিতা করল মক্কার নেতারা, ক্ষমতার মসনদে আসীনরা। তাদের বিত্তবৈভবে এতটুকু ভাঁটা পড়ুক, দাসদের মুক্তি প্রদানের ফলে আয়েশী জীবনের ইতি ঘটুক, ইয়াতীমদের সম্পদ কুক্ষিগত করে ধনের পাহাড় গড়া বন্ধ হোক, সুদ প্রথা উচ্ছেদের মাধ্যমে নিনাশ্রমে অর্থাগমের পথ রুদ্ধ হোক এ তারা এতটুকুও বরদাশত করতে রাজী ছিল না। তাই রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্মপ্রয়াস ক্রমশ; সংকীর্ণ হয়ে এল। তাঁর জীবনের পরে হুমকি এল। দীর্ঘ তের বছর পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করলেন নতুন এক গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ইয়াসরিবে, আজকের মদীনা মুনাওয়ারায়।

মদীনায় তিনি একটি সুদৃঢ় ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করার প্রয়াস চালান একেবারে শুরু হতেই। একই সময়ে সমাজদেহ হতে সকল অনাচার ও পংকিলতা দূর করারও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। অর্থনৈতিক কর্মকান্ড যেহেতু একটি রাষ্ট্রের স্থায়ীত্ব ও সমৃদ্ধির বুনিয়াদ তাই এক্ষেত্রেও তিনি আল-কুরআনের আলোকে ঘোষণা করলেন দশ দফা কর্মসূচী। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মাত্র দশ বছরের মধ্যে শিশু ইসলামী রাষ্ট্রের যে বিকাশ ও উন্নয়ন ঘটতে শুরু করেছিল তা ছিল সমকালীন বিশ্বের বিস্ময়। এরপর দীর্ঘ নয়শত বছর ধরে সেই রাষ্ট্রব্যবস্থা দাপটের সাথে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। একই সংগে তাঁর ব্যতিক্রমী অর্থনৈতিক কর্মসূচীর কল্যাণস্পর্শে সমগ্র মানব জাতি নতুন এক সভ্যতার ইতিহাসের

শতজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের শীর্ষতম ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদ্যমান অর্থনীতির কর্মপদ্ধতি, নীতি ও ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন এনেছিলেন এবং বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর অনুসৃত দশ দফা কর্মসূচীর বদৌলতেই সুদূর স্পেন হতে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল মুসলিম বিশ্বে শোষণমুক্ত ও কল্যাণধর্মী নতুন এক অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল।

প্রসঙ্গত: মনে রাখা দরকার, দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে আল কুরআন সমগ্র মানব জাতির জন্যে এক ঐশী গাইডবুক এবং মানবতার বন্ধু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বাস্তব রূপকার। এক হাদীসে বলা হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কোন কাজ করেননি, এমন কোন কথা বলেননি যাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সম্মতি বা ইঙ্গিত ছিল না। এজন্যেই প্রখ্যাত সুফী সাধক ও দার্শনিক রূমী বলেন-

মুহাম্মাদ হারগিজ না গুফতা তা না গুফতা জিবরাঈল
জিবরাঈল হারগিজ না গুফতা তা না গুফতা কারদিগার।

অর্থ্যাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও কিছু বলেননি যতক্ষণ জিবরীল তাঁকে কিছু না বলেছেন। আর জিবরীল কিছু বলেন নি যতক্ষণ না আল্লাহ পরওয়ারদিগার কিছু বলেছেন। তাই অর্থনীতির ক্ষেত্রেও আল্লাহ তাঁকে যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি সেসবই বাস্তবায়নের জন্যে কর্মকৌশল উদ্ভাবন করেছে, প্রয়োজনে রাষ্ট্রশক্তি পর্যন্ত প্রয়োগ করেছেন। প্রচলিত অর্থনীতিতে রাসূলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছিলেন আজকের যুগের দফার হিসেবে সেগুলিকে দশটি দফার উল্লেখ করা যায়। এই দফাগুলো ছিল আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকারের সমন্বয়। এই কর্মসূচীর মাধ্যেমেই তিনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একাধারে সুনীতির প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতির মূলোৎপাটন করেছিলেন। নীচে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গৃহীত সেই কর্মসূচী তথা দফাগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।
প্রচলিত অর্থনীতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে নতুন বিষয়গুলি প্রবর্তন করেছিলেন সেগুলি হলো-

১। হালাল উপায়ে উপার্জন ও হারাম পথ বর্জন
২। সুদ উচ্ছেদ
৩। ব্যবসায়িক অসাধুতা উচ্ছেদ
৪। যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন
৫। বায়তুলমালের প্রতিষ্ঠা
৬। মানবিক শ্রমনীতির প্রবর্তন
৭। ওশরের প্রবর্তন ও ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার ইসলামীকরণ
৮। উত্তরাধিকার ব্যবস্থার যৌক্তিক রূপদান
৯। ন্যায়সঙ্গত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিধান, এবং
১০। সামাজিক কল্যাণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রবর্তন।

উল্লেখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করলে বোঝা যাবে, এসব কর্মসূচী তৎকালীন অর্থনীতিকে কি প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল, বৈশিষ্টের দিক হতে কি সুদূর প্রসারী ও প্রগতিশীল চরিত্রের ছিল এবং দেশের আপামর জনসাধারণের ভাগ্য উন্নয়নে কি বিপুল সহায়ক হয়েছিল। এই আলোচনা হতে বর্তমানে প্রচলিত অন্যান্য অর্থনৈতিক মতবাদের সঙ্গে ইসলামের অর্থনীতির মৌলিক পার্থক্য ও সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে। উপরন্ত ইসলামই যে বিশ্ব মানবতার একমাত্র মুক্তিসনদ একথা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদর্শিত এই বিশেষ পদক্ষেপগুলি।

ইসলামী বিধানে ব্যবহারিক জীবনে কিছু কাজকে হালাল বা বৈধ এবং কিছু কাজকে হারাম বা অবৈধ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। উৎপাদন, ভোগ ও বন্টনের ক্ষেত্রেও এই বিধান প্রযোজ্য। ইসলামী বিধান অনুযায়ী যে কেউ উপার্জনের পূর্ণ স্বাধীনতা রাখে। এজন্যে সে পছন্দই যে কোন উপায় ও পথ অবলম্বন করতে পারে। এর সাহায্য যে কোন পরিমাণ অর্থও রোজগার করতে পারে। কিন্তু হারাম পদ্ধতিতে একটি পয়সাও উপার্জন করার অধিকার ইসলাম স্বীকার করেনি। ইসলাম-পূর্ব যুগে তো দূরের কথা, বর্তমান সভ্য যুগেও অন্যান্য মতাদর্শ বা ইজমভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপার্জন, ভোগ ও বন্টনের ক্ষেত্রে এই বৈধতা বা হালাল-হারামের পার্থক্য নেই। সেখানে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ অর্থাৎ লাইসেন্স করে নিলে সব ধরনের উপার্জনের পন্থাই বৈধ। সরকারকে ধার্যকৃত কর ফি বা শুল্ক দিলেই যেকোন পরিমাণ আয়েই তার বৈধ মালিকানা স্বীকৃত হবে।

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উৎপাদন, ভোগ ও বন্টনের ক্ষেত্রে কোন শেষসীমা বা বৈধ-অবৈধভাবে প্রশ্ন নেই। এমন কি যেসব পন্থায় উৎপাদন সমাজের জন্যে ক্ষতিকর ও যেসব পন্থায় ভোগ সমাজের জন্যে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সেসবও সমাজ ও অর্থনীতিতে অপ্রতিহতভাবে চলতে পারে। শর্ত শুধু লাইসেন্স করে নেওয়া বা নির্দিষ্ট হারে কর বা ফি ও শুল্ক নিয়মিত পরিশোধ করা। সমাজতন্ত্রের অবস্থাও প্রায় একই রকম। তফাৎ এই যে, সেখানে উপার্জন ও ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতা রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও অতিমাত্রায় সীমিত। তবে ভোগের ক্ষেত্রে পার্টির উর্ধতন কর্মকর্তাদের জন্যে এ সব নিয়ন্ত্রণ সব সময়েই শিথিলযোগ্য। ইসলামে এই দুই ধরনের নীতির কোনটিই সমর্থন করা হয়নি। যা বৈধ ও যে পরিমাণ বৈধ, তা সকলের জন্যেই সমভাবে বৈধ। অনুরূপভাবে যা নিষিদ্ধ তা সকলের জন্যেই সমভাবে নিষিদ্ধ।

বৈধ উপায়েও যে সম্পদ ও অর্থ অর্জিত হয় তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইসলাম বিধি-বিধান আরোপ করেছ। ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে একেবারে স্বাধীন ও বাধা-বন্ধনহীনভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়নি। হালালভাবে প্রাপ্ত বা উপার্জিত সম্পদ মাত্র তিন উপায়েই ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যথা-

১। বৈধ বা হালাল পন্থায় ভোগ
২। লাভজনক প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ এবং
৩। আল্লাহর পথে ব্যয়।

বৈধ বা হালাল পন্থায় ভোগ:

মানুষ তার হালাল অর্জন অর্থাৎ সৎভাবে উপার্জিত অর্থ কেবলমাত্র বৈধ পন্থাতেই ব্যয় করতে পারবে। এমনকি ইসরাফ (অপচয়) ও তাবযীর (অপব্যয়) তার জন্য নিষিদ্ধ। অপব্যয়কারীকে ইসলামে শয়তানের ভাই হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইসলামী সমাজে মানুষ তার বৈধ আয়ও এমনভাবে ব্যয় করতে পারবে না যা তার নিজের চরিত্রের ও সমাজের জন্যে ক্ষতিকর হতে পারে। অর্থাৎ বৈধ পন্থায় আয়ও অবৈধ পন্থায় ব্যয়ের কোন সুযোগ নেই। এজন্যে মদ্যপান, ব্যভিচার, নাচ-গান, রং-তামাশা, জুয়া-বাজী-লটারী, নৈতিকতাবিরোধী বিলাস-ব্যসন, সোনা-রূপার তৈজসপত্র ব্যবহার সবই নিষিদ্ধ। এসব নিষিদ্ধ পথ পরিত্যাগ করে নিজের ও পরিবার পরিজনের জন্যে স্বাভাবিক ব্যয় নির্বাহ ও মধ্যম ধরনের জীবন যাপন করার জন্যেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাগিদ দিয়েছেন।

লাভজনক প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ

নিজের প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত ও সাংসারিক ব্যয় নির্বাহের পর উদ্ধৃত্ত ধন-সম্পদকে ব্যবসায়, কৃষি-শিল্প কিংবা এই ধরনের অন্যান্য অর্থকরী কাজে বিনিয়োগ করার নির্দেশ ইসলামে রয়েছে। নিজের পক্ষে এককভাবে সম্ভব না হলে অন্যের সাথে লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বের অর্থাৎ মুদারিবাতের

ভিত্তিতেও এই জাতীয় কাজে অর্থ বিনিয়োগ করার সুযোগ রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করেছেন। ব্যবসায় সম্পর্কে তিনি বলেছেন- রুজীর দশ ভাগের নয় ভাগই রয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে।

তিনি আরও বলেন-

সত্যবাদী, ন্যায়পন্থী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সমান মর্যাদায় অভিষিক্ত হবে। (তিরমিযী)

আল্লাহর পথে ব্যয় : নিজস্ব ও পারিবারিক খরচ মিটিয়ে ও ব্যবসায়ে বিনিয়োগের পরেও যদি উদ্ধৃত্ত অর্থ থাকে তবে তা থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করাই উত্তম। এপ্রসঙ্গে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-
হে আদম সন্তান! তুমি যদি তোমার উদ্ধৃত্ত সম্পদ আল্লাহর ওয়াস্তে ব্যয় কর তবে তা তোমার জন্যে উত্তম। মুসলমান হিসেবে এভাবেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব।

কোন ব্যক্তির আয় বা ব্যয় অথবা উভয়ই যদি অবৈধভাবে হয় তবে তার কাছে থেকে সমাজ ও দেশ মহৎ কিছু তো দূরে থাক, ভাল কিছুও আশা করতে পারে না। সে ব্যক্তি বরং সমাজের দুষ্টক্ষত। ক্রমেই যদি এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে দেশের বা জাতির রাজনৈতিক আদর্শ যতই উত্তম হোক না কেন তার অধ:পতন অবধঅরিত। তাই ইসলামে আয় ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে বৈধতা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। নিষিদ্ধ বা হারাম করে দেওয়া হয়েছে সব ধরনের অবৈধ বা হারাম পথে আয় ও অবৈধ বা হারাম পথে ব্যয়। একজন মুসলিমের উপার্জন অবশ্যই হালাল বা বৈধ পন্থায় হতে হবে। কোনক্রমেই অবৈধ উপায়ে যেমন উপার্জন করা চলবে না তেমনি হালাল উপার্জনও অবৈধ পথে ব্যয় করা চলবে না।

সাধারণত: যেসব অবৈধ উপায়ে আয়ের পন্থা সমাজে চালু রয়েছে সেসবের মুধ্যে ঘুষ, সুদ, হারাম পণ্যসামগ্রীর ব্যবসা, কালোবাজারী, চোরাকারবারী, নাচ-গান, ফটকবাজারী, পরদ্রব্য আত্মসাৎ, সব ধরনের প্রতরণা, ধাপপাবাজী, পতিতাবৃত্তি, সমস্ত প্রকারের লটারী, জুয়া প্রভৃতিই প্রধান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব হারাম ও অনৈতিক পথে উপার্জন কঠোরভাবে রোধ করেছেন। তৎকালীন সময়েই শুধু নয়, বর্তমান যুগেও অন্য কোনও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এত ব্যাপকভাবে অবৈধ ও অশ্লীল উপায়ে উপার্জন ও ভোগের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি। একারণেই সেসব মতাদর্শে সামাজিক দুর্নীতি ও অনাচারের সয়লাব বয়ে যাচ্ছে।

হারাম উপায়ে উপার্জন নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ মুলত: তিনটি। প্রথমত: অবৈধ আয়ের উদ্দেশ্যে জনগনের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জুলুম করা হয়। হয়রানী করে বা কৌশলে প্রতারণা করে অথবা বাধ্য করে লোকদের নিকট থেকে ব্যক্তিবিশেষ বা অনেক সময় শ্রেণীবিশেষ উপার্জন করে থাকে। এতে জনগণ যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হয় তেমনি সমাজে সৃষ্টি হয় অসন্তোষ। দরিদ্র ও সাধারণ লোক তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হতে হয় বঞ্চিত। উপরন্ত কলহ, বিশৃঙ্খলা বিদ্বেষ ও বিভেদ সৃষ্টির পথ প্রশস্ত হয়। অনেক সময়ে ব্যক্তিবিশেষও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য অবৈধ অর্থ ব্যয় করে থাকে। যেমন উৎকোচ বা ঘুষ। বিশ্বের সর্বত্রই এটা সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। বহু দেশে সামরিক আইন পর্যন্ত চালু করা হয়েছে ঘুষ উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকেই ঘুষ নিতে দেখা গেছে। ঘুষ বা উপরি আয় আজ অন্য আর দশটা উপায়ে আয়ের মতোই খুব সহজ ও

স্বাভাবিক বলে স্বীকৃত হচ্ছে। কিন্তু যারা ঘুষ নেয় বা দেয় তাদের উদ্দেশ্যে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সতর্ক করে দিয়ে বলেন-

ঘুষ গ্রহণকারী ও ঘুষ প্রদানকারী উভয়েরই উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।
(বুখারী, মুসলিম)

দ্বিতীয়ত : চারিত্রিক নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী বিষয় যেমন নৃত্য সঙ্গীত, মদ, বেশ্যাবৃত্তিসহ সবধরনের অশ্লীল কাজ ইসলামী সমাজে নিষিদ্ধ। এসবের ব্যবসা করাও তাই নিষিদ্ধ। সমাজে এসব কাজের এতটুকুও প্রশ্রয় দিলে অশ্লীলতা, বেহায়াপনার কলুষতা ছড়িয়ে পড়বে। এর বিষবাষ্প প্রবেশ করবে সমাজ ও রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। ফলে চরিত্রহননের সীমা থাকবে না। গোটা সমাজ পাপ-পংকিলতায় নিমজ্জিত হবে। সে জন্যেই এসব জিনিষের ভোগ শুধু নিষিদ্ধই নয়, এসবের শিল্প-কারখানা তৈরী করা ও ব্যবসা করা অর্থাৎ এ সমস্ত উৎস হতে উপার্জন করাও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

তৃতীয়ত : অবৈধ উপায়ে অর্জিত ধন-সম্পদ: সাধারণত বৈধ কাজে ব্যয় হয়। আবার অবৈধ কাজেও ব্যয় হয়। অবৈধ কাজে ব্যয়ের অর্থই হচ্ছে সামাজিক অনাচার ও পংকিলতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, অবৈধ ও অসৎ উপায়ে যারা আয় করে থাকে তারা সে আয় নানা সমাজবিরোধী তথা ইসলামী অনুশাসনবিরোধী কাজে ব্যয় করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ নাচ-গান, সিনেমা, নানা রং তামাশা, বিলাস-ব্যসন, মদ্যসক্তি, বেশ্যাগমন, ব্যয়বহুল, প্রাসাদোপম বাড়ী তৈরী প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। এর যে কোন একটিই সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট। যদি এর সবগুলিই কোন সমাজ বা জাতির মধ্যে ক্রমে ক্রমে অনুপ্রবেশ তাহলে গোটা সমাজ ও জাতির চূড়ান্ত সর্বনাশ হবে। এ জন্যই মানবতার মুক্তিদূত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কঠোরভাবে বলেছেন: অবৈধ উপায়ের উপার্জনে তৈরী রক্তমাংস দোযখের খোরাক হবে।

অপব্যয়ের ছিদ্রপথেই সংসারে আসে অভাব-অনটন। সমাজে আসে অশান্তি। অশান্তি আর অনটন হতে রক্ষা পেতে হলে মিতব্যয়ীতাই হওয়া উচিৎ আদর্শ। কৃপণতা যেমন অনাকাংখিত অপব্যয়ও তেমনি অনভিপ্রেত। এ দুয়ের মধ্যবর্তী পথই হচ্ছে উত্তম পথ। অর্থাৎ, মিতব্যয়ীতাই উত্তম পথ। এ ব্যাপারে আল কুরআনে এরশাদ হয়েছে-

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

তারাই আল্লাহর নেক বান্দা যারা অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে না অপচয় ও বেহুদা খরচ করে, না কোনরূপ কৃপণতা করে। বরং তারা এ উভয় দিকের মাঝখানে মজবুত হয়ে চলে।

(সূরা আল ফুরকান : ৬৭ আয়াত)

বাস্তবিকই ব্যক্তি ও সমাজ জীবন তথ্য সামগ্রিক অর্থনৈতিক জীবনে আয় ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে সততা ও মধ্যম পন্থা অনুসরণ করে চললে সুষ্ঠু ও সাবলীল উন্নতি হতে পারে। বস্তুত: পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক অবক্ষয় ও ক্রমবর্ধমান সামাজিক অনাচার ও পাপাচারের মুখ্য কারণ অপব্যয় ও অবৈধ পন্থায় ব্যয়। এজন্যেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মূলোচ্ছেদ করেছিলেন। প্রসঙ্গত : ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের দায়িত্বের কথাও উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তি মানুষের অপরাধ প্রবণতা যদি আল্লাহর ভয়ে ও রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তষ্টি অর্জনের জন্যে স্বত:প্রবৃত্ত হয়ে সংশোধিত না হয় তাহলে সরকার অবশ্যই ইসলামী আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে ন্যূনতম ব্যবস্থা হচ্ছে, যাদের হাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ-সম্পদ রয়েছে তাদের সেসব সম্পত্তি বৈধ বা জায়েজ পথে অর্জিত হয়েছে কিনা তা নির্ণয় করা। এ উদ্দেশ্যেই মহানবী

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশে হিসবাহ নামে একটি দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দপ্তরটির কাজ ছিল অবৈধ উপায়ে আয় রোধ করা, একাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা। অবৈধভাবে গ্রহণ করে থাকলে তা মূল মালিকের কাছে প্রত্যর্পণ করা। যদি তা সম্ভব না হয় বা সেভাবে আয় না হয়ে থাকে তবে তা বায়তুল মালেই জমা দেওয়া হতো।

হারাম আয়ের বড় একটি উৎস হলো জুয়া। আজ যেমন সর্বত্র নানা ধরণের জুয়া চলছে, তেমনি অতীতেও এর প্রচলন ছিল। জুয়ার ইতিহাস বহু প্রাচীন। জুয়ার কবলে পড়ে কত পরিবার যে সর্বস্বান্ত হয়েছে তার ইয়াত্তা নেই। শিল্প বিপ্লবের পর জুয়ার আরও চমকপ্রদ ও নতুন নতুন কৌশল আবিস্কৃত হয়েছে। পূর্বে জুয়ার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল তীর ও পাশার খেলা। পরবর্তীতে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঘোড়াদৌড়, তাসের বিভিন্ন খেলা, হাউজী, রুলেতে, শব্দচয়ন, লটারী প্রাইজবন্ড ইত্যাদি নানা ধরনের ও কৌশলের জুয়া। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ফটকাবাজারী। ফটকাবাজারী সম্পূর্ণতা: পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবদান। শেয়ার মার্কেটে সম্ভাব্য মুনাফার চটকদার হিসেব দেখিয়ে ও অন্যান্য অপকৌশলের মাধ্যমে শেয়ার বিক্রির ফলে কত পরিবার যে রাতারাতি নি:স্ব হয়েছে তার হিসেব নেই। বাংলাদেশের শেয়ার মার্কেট তার জাজ্জ্বল্যমান নজীর। জুয়াকে তাই ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ধোঁকাবাজী বা প্রতারণার ঘোর শত্রু ইসলাম। প্রচলিত সমাজ জীবনে আজ জুয়া যেমন মজ্জাগত হয়ে দাঁড়িয়েছে, ইসলামের আর্বিভাবের যুগেও তেমনি ছিল। জুয়ার খপ্পরে পড়লে নিরীহ মানুষের দুর্দশার সীমা-পরিসীমা থাকে না। কিন্তু একদল লোক এরই মাধ্যমে বিপুল অর্থ উপার্জন করে থাকে। ইসলামের এজন্য সব ধরনের জুয়াকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আলকুরআনে আল্লাহ তায়ালা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে মুমিনগণ! জেনে রাখ, মদ জুয়া মূর্তি এবং (গায়েব জানার জন্যে) পাশা খেলা, ফাল গ্রহণ ইত্যাদি অতি অপবিত্র জিনিষ ও শয়তানের কাজ। অতএব, তোমরা তা পরিত্যাগ কর। তবেই তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে।

সূরা আল মায়েদা : ৯০ আয়াত

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

যে ব্যক্তি ধোঁকাবাজী করে সে আমার দলভূক্ত লোক নয়। (সিহাহ সিত্তাহ)
যে সব কারণে ইসলামে জুয়া ও ফটকাবাজারী নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেগুলি হচ্ছে-

অর্থ ও সময়ের অপচয় : পূর্বেই বলা হয়েছে আল্লাহ নিজেই বলেছেন, অপব্যয়কারীগণ শয়তানের ভাই। সুতরাং জুয়ার মাধ্যমে অর্থের অপব্যয় করে আল্লাহ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ তাঁর অভিশপ্ত শয়তানের ভাই হোক কোন ক্রমেই তা কাম্য হতে পারে না। ঘোড় দৌড়, শব্দচয়ন, তাসের খেলা, লটারী ইত্যাদির দ্বারা কত যে অর্থের ও সময়ের অপচয় হয় তার সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা দু:সাধ্য। তা ছাড়া জুয়া নেশার মতো। একবার এর খপ্পরে পড়লে এ থেকে বাঁচা দায়। একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে পথে না দাঁড়ানো পর্যন্ত অনেক লোকই এর হাত হতে নিষ্কৃতি পায়নি। শুধু মাত্র ঘোড়ার রেসেই কত লোক সর্বস্ব খুইয়েছে তার হিসেব করা শক্ত। বাংলাদেশ পাকিস্তানসহ পৃথিবীর বহু দেশেই আজ ঘোড়ার রেস তাই শুধু নিষিদ্ধই নয়, সম্পূর্ণ উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সামাজিক বিশৃংখলা ও অপরাধ সৃষ্টিকারী :
শুধুমাত্র জুয়ায় হার-জিতের কারণেই মানুষের মধ্যে কলহ ফাসাদ, মারামারি এবং শেষ পর্যন্ত খুন-জখম সংগঠিত হচ্ছে এ রকম নজীর ভুরি ভুরি। আমাদর দেশেও বড় বড় শহরে লঞ্চ বা রেল ষ্টেশনের ধারেই দেখা যাবে নানান ধরনের জুয়ার ফাঁদ পেতে বসে রয়েছে এক শ্রেণীর লোক। শহরগামী গ্রামের নিরীহ মানুষ এদের ফাঁদে পা দিয়ে সমস্ত টাকা-করি খুইয়ে বসে। জুয়ার আড্ডা হতে ফাঁসির মঞ্চে পৌঁছে গেছে এমন দৃষ্টান্ত শুধু বিদেশে নয়, আমাদের দেশেও অভাব নেই। বিদ্বেষ মারামারি নৈরাজ্য ইত্যাদি সামাজিক অনাচার সৃষ্টি করার বা উস্কে দেবার বিশেষ গুণ রয়েছে জুয়ার।

বিপুল প্রতারণা : জুয়ার মাধ্যমে মুষ্টিমেয় লোক বহু লোককে প্রতারণা করে বিনাশ্রমে বিপুল অর্থ উপার্জন করে। পূর্বেই বলা হয়েছে, যাবতীয় অবৈধ উপায়ে আয় ইসলামে সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ। জুয়ার মাধ্যমে উপার্জনও তাই নিষিদ্ধ। জুয়ার দ্বারা কৌশলে অল্প সময়ে বিনা আয়াসে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা সম্ভব বলে একদল লোক যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকা সত্বেও হালালভাবে আয়ের চেষ্টা করে না। উপরোক্ত জুয়ার মাধ্যমে তারা সামাজিক দুর্নীতি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে।

সমাজ হতে দুর্নীতির অবসান ও জুলুমতন্ত্রের বিলোপ সাধনের উদ্দেশ্যে সর্ব প্রথম ও সর্বপ্রধান যে মোক্ষম আঘাতটি হানা হয়েছে তা হচ্ছে সুদের উচ্ছেদ। সুদ ও সুদভিত্তিক সমস্ত কারবার ও লেনদেন চিরকালের জন্যে হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আল কুরআনে এ প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে-

وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। (সূরা আল বাকারাহ : ২৭৫ আয়াত)

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

তোমাদের মধ্যে যারা সুদ খায়, সুদ দেয়, সুদের হিসাব লেখে এবং সুদের সাক্ষ্য দেয় তারা সবাই সমান পাপী।
(তিরমিযী, মুসলিম)

ইসলামী অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থায় যাবতীয় অসৎ কাজের মধ্যে সুদকে সবচেয়ে পাপের জিনিস বলে গণ্য করা হয়েছে। বস্তুত : সুদের মতো সমাজবিধ্বংসী অর্থনৈতিক হাতিয়ার আর দুটি নেই। সুদের কুফলগুলির প্রতি একটু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে কেন সুদ চিরতরে হারাম ঘোষিত হয়েছে।

সমাজ শোষণের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম : একদল লোক বিনাশ্রমে অন্যের উপার্জনে ভাগ বসায় সুদের সাহায্যেই। ঋণগ্রহীতা যে কারণে টাকা ঋণ নেয় সে কাজে তার লাভ হোক বা না হোক সুদের অর্থ তাকে শোধ করতেই হবে। এর ফলে বহু সময়ে ঋণগ্রহীতাকে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পদ বিক্রি করে হলেও সুদসহ আসল টাকা পরিশোধ করতে হয়। সুদ গ্রহীতারা হচ্ছে সমাজের পরগাছা। এরা অন্যের উপার্জন ও সম্পদে ভাগ বসিয়ে জীবন যাপন করে। সমাজের প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে এদের কোন অবদান থাকে না।

দরিদ্র আরও দরিদ্র এবং ধনী আরও ধনী হয় :

দরিদ্র অভাবগ্রস্থ মানুষ সাহায্যের কোন দরজা খোলা না পেয়ে, উপায়ন্তর না দেখে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। সেই ঋণ অনুৎপাদনী দুরকম কাজেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিশেষ করে অনুৎপাদনী কাজে ঋণের

অর্থ ববহারের ফলে তার ঋণ পরিশোধের ক্ষমতাই লোপ পায়। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজে করযে হাসানার কোন সুযোগ না থাকায় অনুৎপাদনী খাতে তো দূরের কথা, উৎপাদনী খাতেও বিনা সুদে ঋণ মেলে না। বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো তাকে সুদ শোধ করতে হয়। ফলে সে তার শেষ সম্বল যা থাকে তাই বিক্রি করে উত্তমর্ণের ঋণ শুধরে থাকে। এই বাড়তি অর্থ পেয়ে উত্তমর্ণ আরও ধনী হয়। একই সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে থাকে সামাজিক শ্রেণী বৈষম্য।

ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় :

কৃষকেরা ফসল ফলাবার তাগিদে নিজেরা খেতে না পেলেও ঋণ করে জমি চাষ করে থাকে। এই ঋণ শুধু যে গ্রামের মহাজনের কাছে থেকেই নেয় তা নয়, বিভিন্ন এনজিও ও সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকেও নেয়। যথোপযুক্ত বা আশানুরূপ ফসল হওয়া সব সময়েই অনিশ্চিত। তাছাড়া, প্রাকৃতিক দুর্বিপাক তো রয়েছেই। যদি ফসল আশানুরূপ না হয় বা প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের ফলে ফসল খুবই কম হয় বা মোটেই না হয় তবু কিন্তু কৃষককে নির্দিষ্ট সময়ান্তে সুদসহ ঋণ শোধ করতে হবে। তা না পারলে কি মহাজন, কি ব্যাংকে-সকলেই আদালতে নালিশ ঠুকে কৃষকের সহায়-সম্পত্তি ক্রোক করিয়ে নেবে। নীলামে চড়াবে দেনার দায়ে। এভাবেই বিশ্বের সমস্ত পুঁজিপতি দেশে ক্ষুদ্র চাষীরা ক্রমেই ভূমিহীন চাষী হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশ তার ব্যতিক্রম নয়।

দ্রব্যমূল্য ক্রমেই বৃদ্ধি পায় :

সুদবিহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ী উৎপাদন খরচের উপর পরিবহন খরচ, শুল্ক (যদি থাকে) এবং স্বাভাবিক মুনাফা যোগ করে পণ্যসামগ্রীর বিক্রি মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। কিন্তু সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে দ্রব্যের এই স্বাভাবিক মূল্যের উপর উপর্যুপুরি সুদ যোগ করে দেওয়া হয়। দ্রব্য বিশেষের উপর তিন থেকে চার বার পর্যন্ত ক্ষেত্র বিশেষে তারও বেশী সুদ যোগ হয়। উদাহরণ স্বরূপ, আমাদের দেশের বস্ত শিল্পের কথাই ধরা যেতে হয়। এই শিল্পের তুলা আমদানীর জন্য আমদানীকারকের কাছ হতে ব্যাংকে দেয় ঋণের জন্যে যে সুদ নেয় তা যুক্ত হয় তুলার উপর। ঐ তুলা থেকে সূতা তৈরীর সময়ে বস্ত্রকল যে ঋণ নেয় তার সুদও যুক্ত হয় কাপড়ের উপর। এরপর কাপড়ের পাইকারী বিক্রেতা তার ব্যবসার উদ্দেশ্যে যে ঋণ নেয় তার সুদও যোগ করে ঔ কাপড় যখন খুচরা দোকানে আসে, বা প্রকৃত ভোক্তা ক্রয় করে তখন সে আসল মূল্যের চেয়ে বহু গুণ বেশী করে দিয়ে থাকে। এমনি ভাবে সমাজে দৈনন্দিন জীবনে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির প্রত্যেকটিতেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সুদ জড়িয়ে আছে। নিরুপায় ভোক্তাকে বাধ্য হয়েই সুদের জন্যে সৃষ্ট এই চড়া মূল্য দিতে হয়। কারণ, সুদনির্ভর অর্থনীতিতে এছাড়া তার গত্যন্তর নেই। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে ব্যক্তি, সমাজ ও অর্থনীতির জন্যে সুদ কত মারাত্মক।

এরই বিপরীতে ইসলামী অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা হলে বিনিয়োগের জন্যে যেমন অর্থের অব্যাহত চাহিদা থাকবে তেমনি সঞ্চয়ের সদ্ব্যবহার হবে। ফলে নতুন নতুন কল-কারখানা স্থাপন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের মাধ্যমে অধিক উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও সম্পদের পূর্ণবন্টন ঘটবে। তা ছাড়া প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। একচেটিয়া কারবার হ্রাস পাবে। অতি মুনাফার সুযোগ ও অস্বাভাবিক বিনিয়োগ প্রবণতা দূর হবে। এই সমস্ত উদ্দেশ্য সাধন ও সব ধরনের শোষণের পথ বন্ধ করে দেবার উদ্দেশ্যেই ইসলামে সুদকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

সর্বপ্রকার ব্যবসায়িক অসাধুতা ইসলামী অর্থনীতিতে শুধু নিন্দনীয়ই নয়, কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বর্তমান বিশ্বে, বিশেষত; পুঁজিবাদী ও আধা পুঁজিবাদী দেশসমূহে ব্যবসায়িক অসাধুতার জন্যে প্রকৃতপক্ষে কোন শাস্তি নেই। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে স্ব স্ব দেশের সরকার হয় খুবই উদার মনোভাব গ্রহণ

করে থাকে, নয়তো তাদের দমন করা বা শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা সরকারের নেই। শুধু কালোবাজারী বা চোরাকারবারীই ব্যবসায়িক অসাধুতা নয়, মজুতদারী, ওজনে কারচুপি, ভেজাল দেওয়া, নকল করা প্রভৃতিও জঘন্য ধরনের অপরাধ।

অধিক লাভের আশায় পণ্য মজুত রাখা বর্তমান বিশ্বের পুঁজিবাদী দেশগুলিতে কোন অপরাধ নয়। অথচ এর ফলে পন্যমূল্য বেড়ে যায় হু হু করে। জনসাধারণের দু:খ কষ্টের সীমা থাকে না। কিন্তু একচেটিয়া কারবারের উদ্দেশ্যেই হচ্ছে এ মজুতদারি। দেখা যাবে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী মৌসুমের শুরুতেই ধান-চাল, পিঁয়াজ, রসুন, সবকরমের ডালসহ নানারকম শস্য বিপুল পরিমাণে গুদামজাত করে রাখে। ফলে বাজারে সৃষ্টি হয় কৃত্রিম সংকট। দাম বেড়ে যায় দ্রুত। এই সুযোগেই বিপুল অর্থ উপার্জন করে মজুতদার। একইভাবে শিল্পজাত পণ্যের ও মজুতদারী চলে। সাবান, টুথপেষ্ট, শিশুখাদ্য, সিমেন্ট, সার, সূতা, চিনি, ভোজ্য তেল, কাগজ টিন ইত্যাদি এমন কোন বস্তু নেই ব্যবসায়ীরা যা মজুত করে না। তার পরিমাণ এত বেশী যে বাজারে কৃত্রিম সংকট দেখা দেবেই। সৃষ্টি হবে এক দু:সহ অস্বাভাবিক অবস্থা। সাধারণ মানুষ তখন এদের কৃপার পাত্র হয়ে দাঁড়ায়। স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে এই ধরনের অবস্থা লক্ষ্য করা গেছে বারবার।

এর প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পণ্য মজুত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন তিনি বলেন-
যে বেক্তি ইহতিকার করবে অর্থাৎ, অতিরিক্ত দামের আশায় চল্লিশ দিন যাবৎ খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় না করে আটক রাখবে আল্লাহর সঙ্গে তার ও তার সঙ্গে আল্লাহর সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।
(মুসনাদে আহমেদ)

মজুতদারী বা ইহতিকার সম্পর্কে তিনি আরও বলেন-
খাদ্যশস্য মজুতকারী ব্যক্তির মনোভাব অত্যন্ত বীভৎস ও কুটিল। খাদ্য দ্রব্যের মূল্য হ্রাস হলে তারা চিন্তিত হয়ে পড়ে আর মূল্য বৃদ্ধির পেলে তারা আনন্দিত হয়।
(মুসলিম)

পরিমাপে কারচুপি ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ওজনে বা মাপে কম দেওয়ার প্রবণতা ব্যবসায়ীদের মধ্যে সংক্রামক ব্যাধির মতো প্রসার লাভ করেছে। পরিমাণে প্রতারণার জন্য জনসাধারণ উচিৎ মূল্য দিয়েও যথোচিত পরিমাণ সামগ্রী হতে বঞ্চিত হয়। অথচ ব্যবসায়ী শ্রেণী অবৈধ উপায়ে আয়ের মাধ্যমে আরও সম্পত্তি অর্জন করে। এ দেশের যে কোন সরকারী ক্রয়কেন্দ্রে আখ, পাট বা ধানের ওজন এবং সাধারণ আড়তাদেরর কলাই, মসুর, হলুদ, সরিষা, চাল, আলু, শাক-সবজী প্রভৃতির ওজন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কিভাবে কৃষকদের প্রতারণা করা হয়। ওজনে ফাঁকি দেওয়া বা ইচ্ছাকৃতভাবে ওজনে কম দেওয়া এসব জায়গায় স্বীকৃত ও স্বাভাবিক ব্যাপার বলে গণ্য। প্রতিবাদ করলে আরও নাজেহাল হতে হয়। পণ্য সামগ্রী নিন্মমানের, ভিজা, সময় পার হয়ে গেছে ইত্যাদি নানা মিথ্যা ও বানোয়াট অজুহাত তাদের হয়রানির একশেষ করা হয়।

এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে ঘোষনা করা হয়েছে-

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿181﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿182﴾ وَلَا تَبْخَسُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿183﴾

তোমরা মাপে ঠিক দাও এবং কারো ক্ষতি করো না, সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ঠিকমত ওজন কর। লোকদের পরিমাপে কম বা নিকৃষ্ট কিংবা দোষমুক্ত জিনিষ দিও না এবং দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়িয়ো না। (সূরা আশ-শোয়ারা : ১৮১-১৮৩)

মজুতদারী থেকে যেমন মুনাফাখোরী মানসিকতার সৃষ্টি হয়, তেমনি ব্যবসায়িক অসাধুতা হতেই নৈতিকতাবিরোধী মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে। এ জন্যেই দেশে দেশে কালোবাজারী ও চোরাকারবারী সংঘটিত হচ্ছে। দেশপ্রেম বা জনগণের স্বার্থ এদের কাছে কোন বিবেচ্য বিষয় নয়। যেভাবেই হোক না কেন, অধিক হতে অধিকতর মুনাফা অর্জনই এদের একমাত্র লক্ষ্য। বৈষায়িক উন্নতির জন্যে এরা নৈতিকতাকে কুরবানী করেছে। একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, চোরাকারবার যেমন দেশের অর্থনৈতিক ধ্বংস ডেকে আনে কালোবাজারীও তেমনই সামাজিক অবক্ষয়ের গতি তরান্বিত করে। এরই প্রতিবিধানের জন্যে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে হিজর নামে এক দপ্তরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই দপ্তরের কাজ ছিল ব্যবসায়ে অসাধুতা নিয়ন্ত্রণ করা এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের দোকানপাট বা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের পরিচালনায় নিয়ে আসা। খুলাফায়ে রাশেদীন (রা) পর্যন্ত এ ব্যবস্থা বহাল ছিল।

যাকাত ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি। আল-কুরআনে নামায কায়েমের পরই যাকাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশেই যাকাত আদায়ের ব্যাপারে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে উদ্বুদ্ধ করেন এবং এজন্যে একটা প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলেন। কেন যাকাতের এই গুরুত্ব? ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার সম্পদ বন্টন তথা সামাজিক সাম্য অর্জনের অন্যতম মৌলিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবেই যাকাত গণ্য হয়ে থাকে। সমাজে আয় ও সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে বিরাজমান ব্যাপক পার্থক্য হ্রাসের জন্যে যাকাত একটি অত্যন্ত উপযোগী হাতিয়ার। যাকাতের সঙ্গে প্রচলিত অন্যান্য সব ধরনের করের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। কারণ, ইসলামের এই মৌলিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একাধারে নৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মূল্যবোধ অন্তর্নিহিত রয়েছে। কিন্তু সাধারণ করের ক্ষেত্রে কোন নৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক তাগিদ নেই।

যাকাত ও প্রচলিত করের মধ্যে অন্তত : চারটি সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। যথা : প্রথমত : কর বাধ্যতামূলকভাবে সরকারকে প্রদত্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ যার জন্যে করদাতা কোন প্রত্যক্ষ উপকার প্রত্যাশা করতে পারে না। সরকারও করের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ দরিদ্র ও অভাবী জনসাধারণের মধ্যে ব্যয়ের জন্যে বাধ্য থাকেন না। পক্ষান্তরে যাকাত হিসেবে আদায়কৃত অর্থ অব্যশই আল করআনে নির্দেশিত লোকদের মধ্যেই মাত্র বন্টন করতে বা তাদের জন্যেই বাবহৃত হবে।

দ্বিতীয়ত : যাকাতের অর্থ রাষ্ট্রীয় সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যয় করা যাবে না। কিন্তু করের অর্থ যেকোন কাজে ব্যয়ের ক্ষমতা ও স্বাধীনতা সরকারের রয়েছে।

তৃতীয়ত : যাকাত শুধুমাত্র বিত্তশালী মুসলিমদের জন্যেই বাধ্যতামূল। কিন্তু কর বিশেষত : পরোক্ষ কর, সর্বসাধরণের উপর আরোপিত হয়ে থাকে। অধিকন্তু প্রত্যক্ষ করেরও বিরাট অংশ জনসাধরণের উপর কৌশলে চাপিয়ে দেওয়া হয়।

চতুর্থত : যাকাতের হার পূর্ব নির্ধারিত এবং স্থির। কিন্তু করের হার স্থির নয়। যে কোন সময়ে সরকারের ইচ্ছানুযায়ী করের হার ও করযোগ্য বস্তু বা সামগ্রীর পরিবর্তন হয়ে থাকে। সুতরাং যাকাতকে কোনক্রমেই প্রচলিত অর্থে সাধারণ কর হিসেবে গণ্য করা যায় না বা তার সঙ্গে তুলনীয় ও হতে পারে না।

ইসলামী শরীয়ত অনুসারে যে সমস্ত সামগ্রীর উপর যাকাত ধার্য হয়েছে সেগুলি হলো-

১। ব্যাংকে/হাতে সঞ্চিত/জমাকৃত অর্থ
২। সোনা, রূপা, এবং সোনা-রূপা দ্বারা তৈরী অলংকার;
৩। ব্যবসায়ের পণ্য সামগ্রী;
৪। জমির ফসল;
৫। খনিজ উৎপাদন; এবং
৬। সব ধরনের গবাদি পশু

উপরোক্ত দ্রব্য সামগ্রীর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ যখন কোন মুসলমান অর্জন করে তখন তাকে যাকাত দিতে হবে। এই পরিমাণকে নিসাব বলে। নিসাবের সীমা বা পরিমাণ দ্রব্য হতে দ্রব্যে ভিন্নতর। একইভাবে যাকাতের হারও দ্রব্য হতে দ্রব্যে ভিন্নতর। যাকাতের সর্বনিম্ন হার শতকরা ২.৫%।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাকাত কাদের প্রাপ্য অর্থাৎ কাদের মধ্যে যাকাতের অর্থ বন্টন করে দিতে হবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন-

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

দান-খয়রা তো পাওনা হলো দরিদ্র ও অভাবীগণের, যে সকল কর্মচারীর উপর আদায়ের ভার আছে তাদের, যাদের মন (সত্যের প্রতি) সম্প্রতি অনুরাগী হয়েছে, গোলামদের মুক্তির জন্যে, ঋণগ্রস্তদের জন্যে, আল্লাহর পথে (মুজাহিদদের) এবং মুসাফিরদের জন্যে। এটি আল্লাহর তরফ হতে ফরয এবং আল্লাহ সব জানেন ও বুঝেন।
(সূরা আত তাওবা : ৬০ আয়াত)

উপরের আয়াত হতে আটটি উদ্দেশ্যে যাকাতের অর্থ ব্যবহারের জন্যে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ পাওয়া যায়। সেগুলি হচ্ছে :

১। দরিদ্র জনসাধারণ
২। অভাবী ব্যক্তি
৩। যে সকল কর্মচারী যাকাত আদায়ে নিযুক্ত রয়েছে
৪। নও-মুসলিম
৫। ক্রীতদাস বা গোলাম মুক্তি
৬। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি
৭। আল্লাহর পথে মুজাহিদ এবং
৮। মুসাফির।

এই আটটি খাতের মধ্যে ছয়টিই দারিদ্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অন্য দুটি খাতও (৩ ও ৭) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা যাকাত আদায় ও ব্যবস্থাপনা একটি কঠিন ও শ্রমসাপেক্ষ কাজ। এ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের এটাই সার্বক্ষণিক দায়িত্ব।
সুতরাং, তাদের বেতন এই উৎস হতেই দেওয়া বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া যেসব ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রামে লিপ্ত তারাও অন্য কোনভাবে জীবিকা অর্জনের সুযোগ হতে বঞ্চিত। সুতরাং, উপরে বর্ণিত

আটটি খাতেই যদি যাকাতের অর্থ ব্যয় হয় তাহলে দরিদ্রতা দূর হবে। একই সঙ্গে অন্যান্য বহু অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার নিরসন হবে।
রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চিতভাবেই জানতেন, ইসলামী রাষ্ট্রে মৌলিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাকাতের প্রতিষ্ঠা হলে বহুবিধ কল্যাণ সাধিত হবে। তাই তিনি যাকাত যথাযথ আদায় ও তার সুষ্ঠ বন্টনের জন্যে কঠোর তাগিদ দিয়ে গেছেন।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় সুষ্ঠুভাবে যাকাত আদায়ের জন্যে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবম ও দশম হিজরীতে আরব ভূখন্ডের বারোটি এলাকায় বারোজন প্রখ্যাত সাহাবীকে দায়িত্ব প্রদান করেন। নীচে এর বিবরণ দেয়া হলো :

নাম্বার এলাকা.... সাহাবীগণের নাম
১। মদীনা মুনাওয়ারা.... বিলাল বিন রাবাহ
২। মক্কা মুয়াযযামা.... হুবায়রাহ বিন শিবল
৩। জেদ্দা.... হারিস বিন নওফল
৪। তায়েফ.... উসমান বিন আবী আল-আস
৫। সানা.... মুহাজির বিন আবি উমাইয়াহ
৬। নাজরান.... আলী বিন আবী তালিব
৭। ইয়ামান.... মুআয বিন জাবাল
৮। বাহরাইন.... আবান বিন সাঈদ
৯। হুনায়ন ....আমর বিন আল-আস
১০। খায়বার.... সাওয়াদ বিন আযীয়াহ
১১। ওয়াদী উল কুরা.... আমর বিন সাঈদ
১২। হাযরামাউত.... যিয়াদ বিন লাবীদ

অনুরূপভাবে চৌদ্দটি প্রধান গোত্র হতে যাকাত আদায়ের দায়িত্ব তিনি বারোজন খ্যাতনামা সাহাবীর উপর অর্পণ করেছিলেন। যথা

গোত্র.... সাহাবীগণের নাম
১। বনু মুসতালিক.... ওয়ালীদ বিন উকরাহ
২। বনু গাতফান..... নওফাল বিন মুয়াবিয়াহ
৩। বনু বনু হাওয়াযিন..... ইকরামাহ বিন আবু জাহেল
৪। বনু গিফার ও বনু আসলাম.... বুরাইদাহ বিন হুসায়ব
৫। বনু হানযালাহ .....মালিক বিন নোওয়াইরাহ
৬। বনু সুলাইম ও বনু মুযাইনাহ ....আব্বাস বিন বশীর আশহালী
৭। বনু তামীম.... উয়ায়নাহ বিন হিসন
৮। বনু জুহায়নাহ.... রাফি বিন মাকীস
৯। বনু ক্বিলাব.... যাহহাক বিন সুফিয়ান
১০। বনু সাকীফ.... কিলাব বিন উমাইয়াহ
১১। বনু আযদ ....হুযায়ফা বিন আল ইমরান
১২। বনু তাঈ ও বনু আসাদ.... আদী বিন হাতীম

যাকাত যথাযথ বিলি বন্টনের জন্যেও নবীজীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্যোগেই বলিষ্ঠ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরী হয়েছিল যা আজকে যেকোন উন্নত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সঙ্গে তুলনীয়।

এ থেকেই বোঝা যায় যাকাত বায়তুলমালের কত বড় গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। এই প্রতিষ্ঠানে নীচে বর্ণিত আট শ্রেনীর কর্মচারী নিয়োজিত ছিল। এর হচ্ছে-

১। সায়ী = গবাদী পশুর যাকাত সংগ্রাহক
২। ক্বাতিব = করণিক
৩। ক্বাসাম = বন্টনকারী
৪। আশির = যাকাত প্রদানকারী ও যাকাত প্রাপকদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনকারী
৫। আরিফ = যাকাত প্রাপকদের অনুসন্ধানকারী
৬। হাসিব = হিসাব রক্ষক
৭। হাফিজ = যাকাতের বস্তু ও অর্থ সংরক্ষক এবং
৮। ক্বায়াল = যাকাতের পরিমাণ নির্ণয় ও ওজনকারী

যাকাতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য বহুবিধ। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান এবং মূখ্য হচ্ছে কতিপয় ব্যক্তির হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হতে না দেওয়া। ইসলাম সামাজিক শ্রেণী বৈষম্যকে শুধু নিন্দাই করে না, বরং তা দূরীভূত করার পদক্ষেপও অবলম্বন করতে বলে। তাই একটি সুখী, সুন্দর এবং উন্নত সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে বিত্তশালী মুসলিমদের অবশ্যই তাঁদের সম্পদের একটা অংশ ব্যয় করা উচিৎ। এর ফলে শুধু অসহায় ও দু:স্থ মানবতার কল্যাণ হবে তায় নয়, আয়-বন্টনের বৈষম্যও হ্রাস পাবে।

যাকাত প্রদানের ফলে সম্পদশালী মুসলিমের মন হতে ধন-সম্পদের লালসা দূরীভূত হবে। দরিদ্রদের অভাব মোচনের জন্যে নিজেদের দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধে তারা সচেতন হবে। বিত্তবান মুসলমানদের আল্লাহ সৎপথে তাঁদের সম্পদ ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছেন। বাৎসরিক উদ্বৃত্ত অর্থ হতে নির্দিষ্ট হারে একটা অংশ দরিদ্র এবং দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের মধ্যে তাঁরা বিতরণ করবেন। এর ফলে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করেন।

যাকাত মজুতদারী বন্ধু করারও এক প্রধান ও বলিষ্ঠ উপায়। মজুতকৃত সম্পদের উপরই যাকাত হিসেব করা হয়ে থাকে। অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ এবং মজুত সম্পদ যে কোন অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। অবৈধভাবে অর্থ মজুত করার ফলে নানারকম সামাজিক সমস্যা দেখা। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিশৃংখলা এর প্রকৃষ্ট নজীর। অল্প কিছু লোকের হাতে বিপুল অবৈধ ও কালো টাকা জমেছিল। সরকারের এমন কোন কৌশল বা পদ্ধতি ছিল না যার দ্বারা এই অবৈধ অর্থের সঠিক পরিমাণ জানা সম্ভব ছিল। ফলে এসবের উপর কোন প্রকার কর বসানো যায়নি। পরিণামে সৃষ্টি হয়েছে ভয়াবহ মুদ্রাস্ফ্রীতি ও সামাজিক শ্রেণী বৈষম্যের।

কোন পদ্ধতিই সার্থকভাবে উপরোক্ত সমস্যার মুকাবিলা করতে সক্ষম নয়। একমাত্র ইসলামেই তার সমাধান রয়েছে। কারণ বিত্তবানের জন্যে তাদের মজুতকৃত অর্থ বা সম্পদের একটা অংশ নিছক বিলিয়ে দেবার মতো কোন পার্থিব কারণ নেই। কিন্তু একজন মুসলমানের আল্লাহ ও আখিরাতের ভয় রয়েছে। উপরন্ত ইসলামী রাষ্ট্রে আল-কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রবর্তিত আইনে সরকারের হাতে প্রভূত ক্ষমতাও রয়েছে মজুত সম্পদকে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ব্যয়, বিতরণ বা সরকারের কাছে সমর্পণে বাধ্য করতে। এর ফলে বিত্তবানদের সামনে দুটি মাত্র পথ খোলা থাকবে-

১। শিল্প বা ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ করা, অথবা

২। ইসলামী অনুশাসন অনুযায়ী তা ব্যয় করা।

যাকাতের অন্যতম অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্যে হচ্ছে ইসলামী সমাজ হতে দরিদ্রতা দূর করা। দারিদ্র মানবতার পয়লা নম্বরের দুশমন। ক্ষেত্রবিশেষে তা কুফরী পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। যে কোন সমাজ ও দেশের এটা সবচেয়ে জটিল ও তীব্র সমস্যা। সমাজে হতাশা ও বঞ্চনার অনুভূতির সৃষ্টি হয়। দারিদ্রতার ফলে। পরিণামে দেখা দেয় সামাজিক সংঘাত। বহু সময়ে রাজনৈতিক অভ্যূত্থান পর্যন্ত ঘটে। অধিকাংশ অপরাধই সচরাচর ঘটে দরিদ্রতার জন্য। এ সমস্যাগুলির প্রতিবিধান করার জন্যে যাকাত ইসলামের অন্যতম মূখ্য হাতিয়ার। যে আট শ্রেণীর লোকের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, যাকাত লাভের ফলে তাদের দিনগুলি আনন্দ ও নিরাপত্তার হতে পারে। যাকাত যথাযথভাবে আদায় ও পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা হলে, আজকের দিনেও এর মাধ্যমে দারিদ্র দূর করা সম্ভব।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পূর্বে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের লোকদের মধ্যে যখন যাকাতের অর্থসামগ্রী বন্টন করে দেওয়া হয় তখন শুধু যে অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয় তাই নয়, বরং অর্থনৈতিক কার্যক্রমেও গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। দরিদ্র ও দুর্গত লোকদের ক্রয় ক্ষমতা থাকে না। বেকারত্ব তাদের নিত্যসঙ্গী। যাকাত প্রাপ্তির ফলে তাদের হাতে অর্থাগম হলে বাজারে কার্যকর চাহিদার সৃষ্টি হয়। এরই ফলে দীর্ঘ মেয়াদে উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন অর্থনৈতিক কার্যক্রমে নতুন প্রেরনার সৃষ্টি হয়, ব্যবসা-বাণিজ্য ও নির্মাণের ক্ষেত্রেও সৃষ্টি হয় অনুকূল পরিবেশ। ফলশ্রুতিতে প্রচলিত সামাজিক শ্রেণীসমূহের মধ্যে আয়গত পার্থক্যও হ্রাস পেতে থাকে।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে বায়তুল মালেরও প্রতিষ্ঠা করেন। বায়তুলমাল বলতে সরকারের অর্থ সম্বন্ধীয় কর্মকান্ড বুঝায় না। বরং বিভিন্ন উৎস হতে অর্জিত ও রাষ্ট্রের কোষাগারে জমাকৃত ধন-সম্পদকেই বায়তুলমাল বলা হয়। ইসলামী রাষ্ট্রের সকল নাগরিকেরই এতে সম্মিলিত মালিকানা রয়েছে। প্রচলিত রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা রাজকীয় ধনাগারের সঙ্গে এর মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালে সঞ্চিত ধন-সম্পদের উপর জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে আপামর জনসাধরণের সাধারণ অধিকার স্বীকৃত। রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে একজন লোকও যেন মৌলিক মানবিক প্রয়াজন হতে বঞ্চিত না হয় তার ব্যবস্থা করা বায়তুলমালের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব।

প্রত্যেক নাগরিকই তা প্রয়োজনীয় পরিমাণ ন্যূনতম অর্থ বা সম্পদ বায়তুলমাল হতে গ্রহণ করতে পারে। সাধ্যানুসারে পরিশ্রম করেও যদি জীবিকার অভাব পূরণ না হয় বা সমাজের স্বচ্ছল লোকজন তাদের দরিদ্র আত্মীয় ও পাড়া-প্রতিবেশীদের প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করার পরও মৌলিক প্রয়োজন অপূর্ণ থেকে যায় তবেই মাত্র বায়তুলমাল হতে সাহায্য গ্রহণ করা যাবে । ইসলামে এভাবেই সমস্ত নাগরিকই জন্যে আর্থিক নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করা হয়েছে । পৃথিবীর ইতিহাসে এ ব্যবস্থা শুধু প্রথমই নয়, মৌলিকও।
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বায়তুলমালের অর্থ সংস্থানের উৎসগুলি নিম্নরূপ :

১। অর্থ সম্পদ ও গবাদি পশুর যাকাত
২। সদাকাতুল ফিতর
৩। কাফফারাহ
৪। ওশর
৫। খারাজ
৬। গণীমতের মাল ও ফাই
৭। জিজিয়া

৮। খনিজ সম্পদের আয়
৯। নদী ও সমুদ্র হতে প্রাপ্ত সম্পদের এক-পঞ্চামাংশ
১০। ইজারা ও কেরায়ার অর্থ
১১। মালিক ও উত্তরাধিকারহীন সম্পদ
১২। আমদানী ও রফতানী শুল্ক
১৩। রাষ্ট্রের মালিকানা ও কর্তৃত্বধীন জমি, বন ব্যবসায় ও শিল্পের মুনাফা
১৪। শরীয়াহ মোতাবেক আরোপিত কর এবং
১৫। বন্ধু রাষ্ট্রসমূহের অনুদান ও উপঢৌকন।

বায়তুলমালের আয় বৃদ্ধির জন্যে উল্লেখিত উৎসসমূহকে অবশ্যই পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। এসমস্ত উৎস হতে যথাযথ ভাবে অর্থাগম নিশ্চিত করা এবং সুষ্ঠ বন্টনের উদ্দেশ্যে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পদাংকে অনুসরণ করে মহান খুলাফায়ে রাশিদীনের (রা) আমলেও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ যাকাতের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

যে সমস্ত খাতে বায়তুলমালের অর্থ ব্যয়ের সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে সেগুলি হচ্ছে :

১। রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার কর্মচারীদের বেতন
২। বন্দী ও কয়েদীদের ভরণ-পোষণ
৩। লা-ওয়ারিশ শিশুদের প্রতিপালন
৪। অমুসলিমদের আর্থিক নিরাপত্তা
৫। করযে হাসানা প্রদান এবং
৬। সামাজিক কল্যাণ

রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারী কর্মচারীদের বেতন :

ইসলামী রাষ্ট্রের তাঁর বেতন বায়তুল মাল হতেই নেবেন। তবে এর পরিমাণ হবে তাঁর প্রয়োজন ও সাম্প্রতিক দ্রব্যমূল্য অনুসারে সাধারণ প্রচলিত হারের সমান। এ ক্ষেত্রে হযরত উমর ফারুক (রা) এর বক্তব্য বিশেষ প্রণীধানযোগ্য। তিনি বলেন-

তোমাদের সামগ্রিক ধনসম্পদ ইয়াতীমের ধনসম্পদের সমতূল্য এবাং আমি যেন ইয়াতীমের মালেরই রক্ষাণবেক্ষণকারী। অতএব আমি যদি ধনী হই-তবে আমি বায়তুলমাল হতে কিছুই গ্রহণ করব না। আর যদি দরিদ্র ও অভাবী হই, তবে অপরিহার্য পরিমাণ কিংবা সাধারণ প্রচলিত মানের বেতনই আমি গ্রহণ করব।

(আবু ইউসূফ-কিতাবুল খারাজ)

অথচ আজ বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহেরেই রাষ্ট্রপ্রধানদের বার্ষিক বেতন ও বিভিন্ন এলাউন্সের পরিমাণ সেসব দেশের রাষ্ট্রীয় কোষাগারে এক বিরাট অংশ। রাষ্ট্রপ্রধানগণ বেতন ছাড়াও নানা ধরনের এলাউন্স ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা এত বেশী পেয়ে থাকেন যে তার হিসেব করলে দেশের সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে পার্থক্যের পরিমাণ দাঁড়াবে ১০,০০০:১।

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় সরকারী কর্মচারীদের জন্যে ভরণ-পোষণের দায়িত্বপালনক্ষম বেতন নীতির কথা বলা হয়েছে। নিম্নপদ বা সাধারণ কর্মচারীদের ন্যূনতম প্রয়োজন অপূর্ণ রেখে উচ্চপদস্থ অফিসারদের বিলাস-ব্যাসনের ব্যবস্থার অনুমতি ইসলাম দেয়নি। বেতন নির্ধারণ সম্পর্কে উমর ফারুক (রা) এর

গৃহীত নীতি এ প্রসঙ্গে সবিশেষ মনোযোগের দাবী রাখে। সে নীতিতে মূখ্য বিচার্য বিষয় ছিল একজন ব্যক্তি-

১। ইসলামের জন্যে কি পরিমাণ দু:খ ভোগ করেছে।
২। ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে কতখানি অগ্রসর হয়েছে
৩। ইসলাম প্রতিষ্ঠার কতখানি কষ্ট স্বীকার করেছে
৪। ইসলামী জীবন যাপনের জন্যে প্রকৃত প্রয়োজন কতখানি এবং
৫। কতজন লোকের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তার উপর অর্পিত রয়েছে।

বন্দী ও কয়েদীদের ভরণ-পোষণ : অত্যাধুনিক এই সভ্য যুগেও বন্দী ও কয়েদীদের সঙ্গে যে অমানুষিক আচরণ করা হয়ে থাকে তা কারো অবিদিত নয়। এদের ন্যূন্যতম প্রয়োজনও মেটানো হয় না। বরং নির্মম ও নির্দয় ব্যবহারের শিকার হয়ে থাকে তারা। ক্ষুৎপিপাসায়, বিনা চিকিৎসায় তিলে তিলে ধুঁকে ধুঁকে মারা যায় বন্দীরা কনসেনট্রেশন ক্যাম্প বা বন্দী শিবিরগুলিতে সোভিয়েত রাশিয়ার লেবার ক্যাম্প ও আফগানিস্তান ও ইরাকে যুদ্ধবন্দীদের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আচরণ এর প্রকৃষ্ট নজীর।

যুদ্ধবন্দী ও বিভিন্ন অপরাধে কয়েদীদের মৌলিক প্রয়োজন মেটাবার জন্যে ইসলামী সরকার বাধ্য। রাসূলে করীম সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বন্দী ও কয়েদীদের সঙ্গে যে অপূর্ব সুন্দর ব্যবহার করেছেন দুনিয়ার ইতিহাসে তার নজীর বিরল। মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে যখন এই নীতি অনুসৃত হতো তখন পাশাপাশি রোমান ও বাইজেন্টাইন শাসকবর্গ তাদের যুদ্ধবন্দী ও কয়েদীদের সঙ্গে যে ব্যবহার করতো তা ছিল নিষ্ঠুর ও হৃদয়বিদারক।

লা-ওয়ারিশ শিশুদের প্রতিপালন : ইয়াতীম, অনাথ ও লা-ওয়ারিশ শিশুদের লালন পালন করা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য। মনে রাখা দরকার, যে সমাজে ইয়াতীমের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ ছিল সাধারণ ঘটনা সেই সমাজেই রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিপ্লবী চেতনার ফলে লা-ওয়ারিশ শিশুরা রাষ্ট্রীয় সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়েছিল। তাদের লালন-পালন ও জীবিকার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতেই ন্যস্ত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-
যে বেক্তি কোন দায়ভার রেখে যাবে তা বহন করা করা আমার কর্তব্য। (আবু দাউদ)

বায়তুল মাল হতেই এই দায়ভার বহনের বিধান করা হয়েছিল। অমুসলিমদের লা-ওয়ারিশ সন্তানদের সম্পর্কেও এই একই নীতি অনুসৃত হতো।

অমুলিমদের আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান : ইসলামের সামাজিক নিরাপত্তা শুধুমাত্র মুসলিম নাগরিকদের জন্যেই নয়, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-ভাষা-লিঙ্গ নির্বিশেষে আবাল বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই এর অন্তর্ভূক্ত। বিধর্মীরা অক্ষম অবস্থায় জিজিয়া দেবে না, বরং রাষ্ট্র তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবে বায়তুল মাল হতে।

করযে হাসানা প্রদান :আইয়ামে জাহেলিয়া বা তার পূর্ববর্তী যুগে বিনা প্রতিদানে ঋণ দেবার রীতি চালু ছিল না। বরং সুদই ছিল লেনদেনের ভিত্তি। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই রীতির মূলোচ্ছেদ করেন এবং বিনা সুদে ঋণ বা করযে হাসানা দেবার রীতি চালু করেন। বিশ্বে প্রচলিত আর কোনও ধরনের অর্থনীতিতে এই ব্যবস্থা পূর্বেও ছিল না, আজও নেই।

সামাজিক কল্যাণ : সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন হতে পারে এমন সব কাজে বায়তুলমাল হতেই অর্থ ব্যয় করার বিধান রয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এই অর্থেই জনগণের কল্যাণ ও মঙ্গলের উদ্দেশ্যে কাজ করা হতো। সরাইখানা নির্মাণ, শিক্ষাবিস্তার, পানির নহর খনন প্রভৃতি তার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য। এ যুগেও শিক্ষার সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থার বিস্তার, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ পদ্ধতির ব্যাপক সম্প্রসারণ, পথিকদের সুবিধার ব্যবস্থা সবই রাষ্ট্রের দায়িত্ব। বিনামূল্যে নির্দিষ্ট একটা স্তর পর্যন্ত শিক্ষাদান, রাস্তা-ঘাট, কালভার্ট ও সেতু নির্মাণ, দিঘী-পুকুর খনন সবই সমাজকল্যাণের আওয়াভুক্ত। মুসাফিরখানা স্থাপন, ভিক্ষাবৃত্তির উচ্ছেদ, গরমৌসূমে কাজের বিনিময়ে খাদ্যের যোগান, পুষ্টিহীনতা দূর, শ্রমিক কল্যাণ প্রভৃতিও সরকারের দায়িত্ব। এসব দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে বায়তুল মালের অর্থ ও সম্পদ হবে সবচেয়ে বড় সহায়ক।

কোন নাগরিক যখন দারিদ্র হয়ে পড়বে, বৃদ্ধ হয়ে উপার্জন ক্ষমতা হারাবে তখন তার যাবতীয় প্রয়োজন মেটাবার দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই গ্রহণ করতে হবে। রাষ্ট্রের উপর নাগরিকদের এই অধিকার ন্যায়সঙ্গত ও স্বাভাবিক। রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর খুলাফায়ে রাশেদীনও (রা) এই দাবী পূরণে যত্নবান ছিলেন।

বিশ্বের ইতিহাসে মানবতার বন্ধু রাহমাতুল্লিল আলামীনই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম মানবিক শ্রমনীতির প্রবর্তন করেন। তাঁর পূর্বে কোন দেশ বা অর্থনীতিতেই শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়াস গ্রহীত হয়নি। এমনকি পরেও কোন দেশ বা মতবাদে সমতুল্য কোন নীতি গৃহীত হয়নি। আজ হতে চৌদ্দশত বছর পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রবর্তিত শ্রমনীতি আজও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শ্রমনীতি। পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অনুসৃত শ্রমনীতি মানবিক নয়, ইনসাফভিত্তিক তো নয়ই। শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, শ্রমিকদের সঙ্গে ব্যবহার, তাদর বেতন ও মৌলিক প্রয়োজন পূরণ ইত্যাদি প্রসঙ্গে রাসূলে করীমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদর্শিত পথ ও হাদীসসমূহ থেকেই ইসলামের বৈপ্লবিক ও মানবিক শ্রমনীতির সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে। মজুরদের অধিকার সম্বন্ধে তিনি বলেন-

তারা তোমাদের ভাই! আল্লাহ তাদের দায়িত্ব তোমাদের উপর অর্পণ করেছেন। কাজেই আল্লাহ যাদের উপর এরূপ দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন তাদের কর্তব্য হলো তারা যে রকম খাবার খাবে তাদেরকেও সেরকম খাবার দেবে, তারা যা পরিধান করবে তাদেরকে তা পরাবার ব্যবস্থা করবে। যে কাজ করা তাদের পক্ষে কষ্টকর ও সাধ্যতীত তা করার জন্যে তাদেরকে কখনও বাধ্য করবে না। যদি সে কাজ তাদের দিয়েই করাতে হয় তা হলে সে জন্যে তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য অবশ্যই করতে হবে। (বুখারী)

অন্যত্র রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শ্রমিকদের সম্পর্কে বলেছেন, শ্রমিককে এমন কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না, যা তাদেরকে অক্ষম ও অকর্মণ্য বানিয়ে দেবে।
(তিরমিযী)

তাদের উপর ততখানি চাপ দেওয়া যেতে পারে, যতখানি তাদের সামর্থ্যে কুলায়। সাধ্যাতীত কোন কাজের নির্দেশ কিছুতেই দেওয়া যেতে পারে না।
(মুয়াত্তা, মুসলিম)

মজুরদের বেতন, উৎপাদিত পণ্যে তাদের অংশ ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন-
মজুরের মজুরী তার গায়ের ঘাম শুকাবার পূর্বেই পরিশোধ কর।
(ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)

মজুরকে তার কাজ হতে অংশ দান কর। কারণ, আল্লাহ মজুরকে কিছুতেই বঞ্চিত করা যেতে পারে না। (মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল)

উপরোক্ত হাদীসসমূহ হতে যেসব মূলনীতি পাওয়া যায় সেগুলোই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রবর্তিত মানবিক শ্রমনীতি। সংক্ষেপে এগুলো হচ্ছে-

১। উদ্যোক্তা বা শিল্প মালিক মজুর-শ্রমিককে নিজের ভাইয়ের মতো মনে করবে। সহোদর ভাইয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে এ ক্ষেত্রেও সে রকম সম্পর্ক থাকবে।

২। অন্ন বস্ত্র-বাসস্থান প্রভৃতি মৌলিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে শ্রমিক ও মালিক উভয়ের মান সমান হবে। মালিক যা খাবে ও পরবে শ্রমিককেও তাই খেতে ও পরতে দেবে।

৩। সময় ও কাজ উভয় দিক দিয়েই শ্রমিকদের সাধ্যমতো দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে, তার বেশী নয়। শ্রমিককে এত বেশী কাজ দেওয়া উচিৎ হবে না যাতে সে ক্লান্ত ও পীড়িত হয়ে পড়ে। এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাকে শ্রম দিতে বাধ্য করা যাবে না, যার ফলে সে অক্ষম হয়ে পড়ে। শ্রমিকের কাজের সময় নির্দিষ্ট হতে হবে এবং বিশ্রামের সুযোগ থাকতে হবে।

৪। যে শ্রমিকের পক্ষে একটি কাজ করা অসাধ্য তা সম্পন্ন হবে না এমন কথা ইসলাম বলে না। বরং সে ক্ষেত্রে আরও বেশী সময় দিয়ে বা বেশী শ্রমিক নিয়োগ করে তা সম্পন্ন করা যেতে পারে।

৫। শ্রমিকদের বেতন শুধুমাত্র তাদের জীবন রক্ষার জন্যে যথেষ্ট হলে হবে না। তাদের স্বাস্থ্য, শক্তি ও সজীবতা রক্ষার জন্যে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ব্যয়ের ভিত্তিতেই বেতন নির্ধারণ করতে হবে।

৬। উৎপন্ন দ্রব্যের অংশবিশেষ বা লভ্যাংশের নির্দিষ্ট অংশও শ্রমিকদের দান করতে হবে।

৭। শ্রমিকদের কাজে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে তাদের প্রতি অমানুষিক আচরণ বা নির্যাতন করা চলবে না। বরং যথাযথ সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে।

৮। চুক্তিমত কাজ শেষ হলে অথবা নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হলে শ্রমিককে দ্রুত মজুরী বা বেতন পরিশোধ করতে হবে। এ ব্যাপারে কোন ওজর-আপত্তি বা গাফলতি করা চলবে ন।

৯। পেশা বা কাজ নির্বাচন করার ও মজুরীর পরিমাণ বা হার নির্ধারণ সম্পর্কেও দর-দস্তর করার পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার শ্রমিকের রয়েছে। বিশেষ কোন কাজে বা মজুরীর বিশেষ কোন পরিমাণের বিনিময়ে কাজ করতে জবরদস্তি করা যাবে না।

১০। কোন অবস্থাতেই মজুরদের অসহায় করে ছেড়ে দেওয়া চলবে না। তারা অক্ষম ও বৃদ্ধ হয়ে পড়লে পেনশন বা ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে বায়তুল মালের তহবিল ব্যবহৃত হতে পারে।

উপরে বর্ণিত নীতিমালার আলোকে দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যেতে পারে যে, ইসলাম মজুরের যে মর্যাদা ও অধিকার স্বীকৃত হয়েছে এবং শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাতে শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের কোন সুযোগ থাকে না। দুইয়ের সম্মিলিত চেষ্টা ও আন্তরিকতা পূর্ণ সহযোগিতার ফলে শিল্পের ক্রমাগত উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হওয়াই স্বাভাবিক। সর্বোপরি মুমিন মুসলমান শিল্প-মালিক ও উদ্যোক্তরা ঈমানের তাগিদে পরকালের কঠিন শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যেই এই শ্রমনীতি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবে। অন্য কোন ধরনের অর্থনীতিতে যা প্রত্যাশা

করা একেবারেই অসম্ভব। দুনিয়ার মজুদুর এক হও শ্লোগানসর্বস্ব সমাজতন্ত্রের বাধ্যতামূলক শ্রমদান যেমন এখানে অনুপুস্থিত, তেমনি পুঁজিবাদী মালিকের অবমাননাকর শর্ত ও লাগামহীন শোষণও নেই। শ্রমিক ও মালিক পরস্পর ভাই-এই বিপ্লবাত্মক ঘোষণাই ইসলামী শ্রম। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা বাস্তবায়নে পূর্ব পর্যন্ত আব ভূখন্ডে ভূমি রাজস্বের কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অবস্থার পরিবর্তন সাধন করেন। সমগ্র বিশ্ব মুসলিমের জন্যে তিনি একটি নির্দিষ্ট হারে ওশর নির্ধারণ করেছিলেন। কৃষি কাজের উপযুক্ততার দিক থেকে জমির দুটি শ্রেণী রয়েছে-সেচবিহীন ও সেচযুক্ত। প্রথমোক্ত ভূমি আল্লাহর অফুরন্ত রহমত বৃষ্টির পানিতেই সিক্ত হয়। অন্যটিতে মানুষ কায়িক শ্রম, পশুশ্রম বা যন্ত্রের সাহায্যে জলসেচ করে কৃষি কাজের উপর উপযুক্ত করে নেয়। এই উভয় ধরনের জমির ওশরের ব্যাপারে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তা নিম্নরূপ-

মুসলমানদের নিকট থেকে ওশর (এক-দশমাংশ) আদায় করবে। এই পরিমাণ ফসল ঐসব জমি হতে গ্রহণ করা হবে যা বৃষ্টি বা ঝর্ণার (স্বাভাবিক) পানিতে সিক্ত হয়। কিন্তু যেসব জমিতে স্বতন্ত্রভাবে পানি সেচ করতে হয় সেসব হতে এক-বিংশতি অংশ (নিসফে ওশর) আদায় করতে হবে। (তারীখ-ই-তাবারী, ফতুহুল বুলদান)

এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হচ্ছে যে, প্রতিটি মুসলিম তার জমিতে বছরে যা কিছু উৎপন্ন হোক না কেন তা থেকে ওশর অর্থাৎ এক-দশমাংশ এবং ক্ষেত্র বিশেষ ওশরের অর্ধেক অর্থাৎ এক বিংশতি অংশ বায়তুল মালে জমা দেবে। অবশ্য নিসাব পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হলে তবেই ওশর আদায় করতে হবে। ওশরের কয়েকটি অনন্য বৈশীষ্ট্য রয়েছে নীচে সেগুলি উল্লেখ করা গেল।

প্রথমত:

ওশর কখনই এবং কোন অবস্থাতেই রহিত করা যাবে না। এর হারও চিরকালের জন্যে নির্দিষ্ট। এ থেকে কোন অবস্থাতেই কাউকে অব্যহতি দেওয়া যেতে পারে না। তবে কোন মৌসুমে কোন ফসল নিসাব পরিমাণের কম উৎপন্ন হলে তার ওশর আদায় করতে হবে না।

দ্বিতীয়ত:

ওশর আদায় করতে হবে প্রতিটি ফসল হতেই। অর্থাৎ যেসব জমিতে বছরে দুটি বা তিনটি ফসল হবে সেই ফসলের প্রত্যেকটি হতেই ওশর আদায় করতে হবে। এর ফলে বায়তুল মালের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, পরোক্ষভাবে জাতি ও দেশেরই খেদমত করা হবে।

তৃতীয়ত :

ওশর আদায় করতে হবে ফসলের দ্বারাই। এ ব্যবস্থা কৃষক বা ভূমি মালিকের জন্যে খুবই অনুকূল। কারণ, ফসল কমই হোক আর বেশীই হোক, তা থেকে নির্দিষ্ট অংশ পরিশোধ করতে কৃষকের অসুবিধার সম্ভবনা নেই। তাছাড়া নগদ টাকা যদি ওশর দিতে হয় তাহলে কৃষকের অসুবিধা হওয়ার সম্ভবনা থাকে। ফসলের দাম কখনই নির্দিষ্ট থাকে না। কোন বছর যদি বিশেষ কোন ফসল বেশী পরিমান উৎপন্ন হয় বা অন্য কোন নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে মূল্য হ্রাস পায় তাহলে নির্দিষ্ট ওশর পরিশোধ করার জন্যে কৃষক অধিক পরিমাণে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হবে। এতে কৃষকের স্বার্থ ক্ষুন্ন হবে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মতবাদ অনুযায়ী নানা ধরনের ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা চালু রয়েছে। ইউরোপ, বিশেষত: ইংল্যান্ডে এই সেদিনও ভূমিদাসদের দ্বারা জমি চাষ করানো হতো।

সাধারণ রায়তদের উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকের বেশী জমিদার ও চার্চের নামে আদায় করা হতো। ভূমির মালিকানা মুষ্টিমেয় পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এর পর শিল্প বিপ্লবের ফলে জমির উৎপাদন যখন বহুগুন বৃদ্ধি পায়, তখন বড় বড় শিল্পপতিরা হাজার হাজার একর জমি সস্তায় কিনে একই সঙ্গে ভূস্বামী হয়ে বসে। উপরন্ত নব্য জমিদাররা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি হয় কিনে নেয় অথবা শক্তির দ্বারা চাষীদের জমি থেকে উচ্ছেদ করে। ফলে বেকার ও ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সমাজতন্ত্রে ভূমিস্বত্ব নীতিতে জমির ব্যক্তি মালিকানা শুধু অস্বীকারই করা হয়নি, বরং ব্যক্তিকে জমি হতে উচ্ছেদ করা হয়েছে। সমস্ত জমি রাষ্ট্রের একচ্ছত্র মালিকানায় আনা হয়েছে। এ জন্য লক্ষ লক্ষ লোককে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। লেবার ক্যাম্প ও বন্দী শিবিরে পাঠানো হয়েছে আরও বহু লক্ষকে। নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে হাজার হাজার ভূস্বামীকে। তবেই জমি রাষ্ট্রয়ত্বকরণ করা সম্ভব হয়েছিল। উপরন্ত কৃষকদের এই রাষ্ট্রীয় ও যৌথ খামারে কাজ করতে গায়েব জোরে বাধ্য করা হয়েছে। বিনিময়ে অনেক সময় তাদের ভরণ-পোষণের উপযুক্ত ন্যূন্যতম পারিশ্রমিকও জোটেনি।

এই উভয় প্রকার ভূমিব্যবস্থাই বঞ্চনামূলক ও স্বভাববিরোধী। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সমাজ ও জাতি বঞ্চিত ; সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি মানুষ শুধু বঞ্চিত হয়, বরং শোষিত ও নিপীড়িত। এই অবস্থা যেন আদৌ সৃষ্টি না হয় সেজন্য চৌদ্দশত বছর পূর্বেই রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক অনন্য ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিস্বত্ব নীতি ঘোষণা করেছিলেন। আব্বাসীয় খিলাফত পর্যন্ত সে নীতি অনুসারে ভূমির বিলি-বন্টন ও মালিকানা নির্ধারিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চূড়ান্ত ফায়সালা করে দিয়েছেন, জমি জায়গা সব কিছুই আল্লাহর। মানুষ তাঁরই দাস। অতএব যে ব্যক্তি অনাবাদী জমি চাষ উপযোগী ও উৎপাদনক্ষম করে তুলবে তার মালিকানা লাভে সেই-ই অগ্রাধিকার পাবে।
(আবু দাউদ)
ইসলাম ভূমিস্বত্ব নীতি অনুযায়ী জমির মালিকানা লাভ ও ভোগদখলের দৃষ্টিতে জমিকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। সে গুলি হচ্ছে-

১। আবাদী ও মালিকানাধীন জমি। মালিকের বৈধ অনুমতি ব্যতীত এই জমি অপর কেউ ব্যবহার বা কোন অংশ দখল করতে পারবে না।

২। কারো মালিকানাভূক্ত হওয়া সত্বেও পতিত আবাদ অযোগ্য জমি। এই জমিতে বসবাস নেই, কৃষিকাজ হয় না, ফলমূলের চাষ হয় না। এই শ্রেণীর জমিও মালিকেরই অধিকারভুক্ত থাকবে।

৩। জনগণের সাধারণ কল্যাণের জন্যে নির্দিষ্ট জমি। কবরস্থান, মসজিদ, মাদ্রাসা, ঈদগাহ, স্কুল-কলেজ, চারণ ভূমি ইত্যাদি সর্বসাধারণের জন্যে নির্দিষ্ট জমি এই শ্রেণীর আওতাভূক্ত।

৪। অনাবাদী ও পরিত্যক্ত জমি যার কোন মালিক নেই বা কেউ ভোগ-দখলও করছে না। এ ধরনের জমির বিলি-বন্টন সম্পর্কে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। অনাবাদি, অনুর্বর, মালিকহীন ও উত্তরাধীকারহীন জমি-জায়গা এবং যে জমিতে কেউ চাষাবাদ ও ফসল ফলানোর কাজ করে না তা ইসলামী রাষ্ট্রের উপযুক্ত লোকদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ ব্যপারে সকল মুসলমানদের সাধারণ ও নির্বিশেষ অধিকার স্বীকার ও সর্বসাধারণের কল্যাণ সাধনই নীতি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।
(আবু ইউসুফ-কিতাবুল খারাজ)

ইসলামে মাত্র একপ্রকার ভূমিস্বত্বই স্বীকৃত-রাষ্ট্রের সঙ্গে ভূমি মালিকের সরাসরি সম্পর্ক। জমিদার তালুকদার মানবদার প্রমুখ মধ্যস্বত্বভোগীর কোন স্থান ইসলামে নেই। সে কারণে শোষণও নেই। উপরন্ত ওশর (ক্ষেত্রে বিশেষে ওশরের অর্ধেক) ও খারাজ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকায় জমির মালিক বা কৃষকদের উপর ইনসাফ ও ইহসান করা হয়েছে।
জমি পতিত রাখাকে ইসলাম সমর্থন করেনি, সে জমি রাষ্ট্রের হোক আর ব্যক্তিরই হোক। জমির মালিক যদি বৃদ্ধ, পংগু, শিশু বা স্ত্রীলোক হয় অথবা চাষাবাদ করতে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ হয় তবে অন্যের দ্বারা জমি চাষ করাতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ হচ্ছে-

যার অতিরিক্ত জমি রয়েছে সে তা হয় নিজে চাষ করবে, অন্যথায় তার কোন ভাইয়ের দ্বারা চাষ করাবে অথবা তাকে চাষ করতে হবে।
(ইবনে মাজাহ)

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

সেই জমি নিজেরা চাষ কর কিংবা অন্যদের চাষ করাও।
(মুসলিম)

উপরে বর্ণিত হাদীস দুটির আলোকেই উমর ফারুক (রা) হযরত বিলাল ইবনুল হারেস (রা) এর নিকট হতে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদত্ত জমির যে পরিমাণ তাঁর চাষের সাধ্যাতীত ছিল তা ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং মুসলিম কৃষকদের মধ্যে পুনর্বন্টন করে দিয়েছিলেন।

বর্তমান সময়ে প্রতি ইঞ্চি জমি চাষের আওতায় আনবার জন্যে এক দিকে কিছু দেশ আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। অন্যদিকে ফসলের দাম কমে যাওয়ার ভয়ে কোন কোন দেশে হাজার হাজার একর জমি ইচ্ছাকৃতভাবে অনাবাদী ও পতিত রাখা হচ্ছে। তাই সামগ্রিকভাবে পৃথিবীতে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ফলে বিশ্ব খাদ্যের অনটন লেগেই রয়েছে। সুতরাং জমি যেমন ইচ্ছাকৃতভাবে অনাবাদী ও পতিত রাখা যাবে না তেমনি সমস্ত পতিত জমি চাষের আওতায় আনতে হবে। ইসলামের দাবীই তাই। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পতিত জমি শুধু ব্যক্তিকে চাষ করতেই বলা হয়নি, উৎসাহ দেবার জন্যে ঐ জমিতে তার মালিকানাও স্বীকার করা হয়েছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

যে লোক পোড়ো ও অনাবাদী জমি আবাদ ও চাষযোগ্য করে নেবে সে তার মালিক হবে।
(আবু দাউদ)

ইচ্ছাকৃতভাবে জমি অনাবাদী রাখার কোন সুযোগ ইসলামে নেই। বরং জমি চাষের জন্যে এতদূর হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, ইচ্ছাকৃতভাবে কোন আবাদী জমি পর পর তিন বছর চাষ না করলে তা রাষ্ট্রের দখলে চলে যাবে। রাষ্ট্রই তা পুনরায় কৃষকদের মধ্যে বিলি-বন্টন করে দেবে।

উন্নত কৃষি ব্যবস্থার মূখ্য শর্ত হিসেবেই উন্নত ভূমিস্বত্ব ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন হওয়া দরকার। এ জন্যে ইসলামের সেই প্রারম্ভিক যুগে বিশ্ব মানবতার কল্যাণকামী ও শান্তির পথিকৃৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ভূমিস্বত্ব ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল তা আজও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিধান। মানবিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কোন কিছু দিক দিকেই এর সমকক্ষ ও সমতূল্য কোন বিধানই আজকের পৃথিবীর নেই।

উত্তরাধিকার আইন

শুধু আরব ভূখন্ডেই নয়, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবির্ভাবের পূর্বে সারা বিশ্বে ভূমির উত্তরাধিকার আইন ছিল অস্বাভাবিক। তখন পর্যন্ত পুরুষানুক্রমে পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র সন্তানই সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারত্ব লাভ করতো। বঞ্চিত হতো পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। এছাড়া সমাজে যৌথ পরিবার প্রথা চালু ছিল। এ প্রথার মূল বক্তব্য হচ্ছে সম্পত্তি গোটা পরিবারের হাতেই থাকবে। পরিবারের বাইরে তা যাবে না। ফলে মেয়েরা বিয়ের পর পিতার সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হতো। উপরন্ত সম্পত্তির কর্তৃত্ব বা ব্যবস্থাপনার ভার জ্যেষ্ঠ পুত্রসন্তানের হাতেই ন্যস্ত থাকত। এই দুটি নীতিই হিন্দু, খ্রীষ্টান ও ইহুদী ধর্মে অনুসৃত হয়ে আসছিল যুগ যুগ ধরে। সম্পত্তি যেন বিভক্ত না হয় তার প্রতি সব ধর্মের ছিল তীক্ষ্ম নজর। কারণ সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গেলে পুঁজির পাহাড় গড়ে উঠবে না, গড়ে উঠবে না বিশেষ একটি ধনিক শ্রেণী যারা অর্থবলেই সমাজের প্রভুত্ব লাভ করে। এরাই নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে অত্যাচার, অবিচার, অনাচার ও নানা ধরণের সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে থাকে।

উত্তরাধীকারিত্বের ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অধিকারের স্বীকৃত প্রদান ও প্রতিষ্ঠা ছিল রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনন্য অবদান। ইসলাম-পূর্ব যুগে সাধারণভাবে সম্পত্তিতে নারীদের কোন অধিকার ছিল না। ক্ষেত্রেবিশেষ অনুকম্পাবশত: কাউকে কিছু দিলেও তা ছিল নিতান্তই দয়ার দান, অধিকার নয়। কিন্তু কখনোই কন্যারা পিতারা বা স্ত্রীরা স্বামীর সম্পত্তির মালিকানা বা উত্তরাধিকারত্ব লাভ করতো না। বরং নারীরা নিজেরাই ছিল পন্যসামগ্রীর মতো। এই অবস্থার অবসান ও প্রতিনিধিদের জন্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল কুরআনে সূরা আন নিসার দুটি দীর্ঘ আয়াতে সম্পত্তির ওয়ারিশ বা উত্তরাধীকারিনী হিসেবে নারীদের অংশ নির্দিষ্ট করে দিলেন। সেই প্রথম পৃথিবীতে মাতা, ভগ্নি স্ত্রী ও কন্যা হিসেবে সম্পত্তিতে নারীর অধিকার ও অংশ স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হলো। এ বিধান ছিল সম্পত্তির এককেন্দ্রীকরণ বা পুঞ্জিভূতকরণ নিরোধের এক মোক্ষম ব্যবস্থা। অধিকন্তু মানুষের খেয়াল-খুশীর উপর সম্পত্তির উত্তরাধিকারত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়নি।

ইসলাম নারীকে দুই দিয়ে সম্পত্তিতে অংশীদারত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রথমত : পিতার দিক হতে, দ্বিতীয়ত: স্বামীর দিক হতে। পিতার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার বর্তাবে। একইভাবে স্বামীর মৃত্যুর পর তার সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। উপরন্ত স্ত্রী তার দেনমোহরও পাবে। এভাবেই পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে যুগপৎ উত্তরাধিকাত্ব প্রদান করা হয়েছে নারীকে। যদি কোন কারণে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ হয় তাহলে ইদ্দৎ পালনের সময়ে ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার বহন করতে হবে। স্বামীকেই। তা ছাড়া স্বামী মারা গেলে তখনও তারই বাড়ীতে নূন্যতম এক বছর স্ত্রীর বসাবাসের হক রয়েছে, যদি তার মধ্যে স্ত্রী পুনরায় বিবাহ না করে। ঐ সময়ের খরচও স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিই হতেই বহন করা হবে।

প্রসঙ্গত : স্মরণীয় যে, ইসলামের এই কালজয়ী, যুগান্তকারী ও বৈপ্লবিক পদক্ষেপ যখন গৃহীত হয়েছিল নারী তখন বিবেচিত হতো সাধারণ পন্যের মতো। কন্যাসন্তান জন্ম ছিল অপরাধের শামিল। তাদেরকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলা হত। ইসলাম পূর্ববর্তী কোন সমাজেই নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও অধিকারের স্বীকৃতি ছিল না।

পুঁজিবাদী সামাজে উইল করে কোন বিত্তশালী মানুষ যেকোন কাজে তার সমুদয় সম্পত্তি দান করে যেতে পারে। বিশেষ করে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের শেষ নির্দেশ বা অসিয়তের সামাজিক ও আইনগত মূল্য খুব বেশী। এর সুযোগ নিয়ে মানুষ মৃত্যুর পূর্বে তার সর্বস্ব দান করে যায় ইচ্ছামতো যে কাউকে, ক্ষেত্রবিশেষ কুকুর, বিড়াল বা পাখীর জন্য। এর পরিমাণ লক্ষ লক্ষ ডলার হয়ে থাকে। এমনও নজীর রয়েছে যে একাদিকে পুত্র-কন্যা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে পথে পথে ঘোরে, অপরদিকে কুকুর-বিড়ালের জন্যে সম্পত্তি উইল করে যায়। ইসলামে অসিয়ত করর ব্যাপারে ও রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিক নির্দেশনা রয়েছে। কোন ব্যক্তি অসিয়ত করতে পারে তার সম্পত্তির সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত, তার বেশী নয়। করলেও তা ইসলামী আইনে সিদ্ধ হবে না। এই অসিয়তও কার্যকর হবে মৃতের যদি কোন ঋণ বা কর্জ ও কাফফারা থেকে তবে তা পরিশোধের পর।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্যে সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। অন্যসব অর্থনৈতিক বিবেচনাকে সামাজিক সুবিচার ও মূলনীতির আলোকেই বিচার-বিশ্লেষণ ও গ্রহণ করতে হবে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিচার ব্যহত হতে পারে এমন কোন অর্থনৈতিক নিয়ম বা নীতি কার্যকর করতে বা থাকতে দেওয়া কিছুতেই সঙ্গত হতে পারে না। এই উদ্দেশ্যেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রেকে অবশ্যই মারুফ বা সুনীতির প্রতিষ্ঠা এবং মুনকার বা দুর্নীতির প্রতিরোধ করতে হবে। অর্থনীতিতে সুনীতি প্রতিষ্ঠার অর্থ হচ্ছে সমস্ত উপায়ে সুবিচারমূলক অর্থনীতি গড়ে তোলে। আর দুর্নীতি প্রতিরোধের অর্থ হচ্ছে সব ধরণের অর্থনৈতিক জুলুম ও শোষণের পথ বন্ধ করা।

সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও জুলুমের অবসানের জন্যে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় সব আইন রচনা করতে পারে। এজন্যে প্রয়োজনীয় আইনগত ক্ষমতা আল্লাহ তাআলা আল কুরাআনেই প্রদান করেছেন। ইসলামী সরকার আইন প্রয়োগ করে অবৈধ উপার্জণের সমস্ত পথ বন্ধ করে দিতে পারে, পারে সব ধরনের অনাচারের উচ্ছেদ করতে। এই উপায়েই রাষ্ট্র সুদ, ঘুষ, মুনাফাখোরী, মজুতদারী, চোরাচালান,কালোবাজারী, পরদ্রব্য আত্মসাৎ, সব ধরনের জুয়া, হারাম সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রচলিত সব ধরনের অসাধুতা সমূলে উৎপাদন করতে পারে। রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপেই মাধ্যমেই যাকাত আদায় ও বিলি-বন্টন, বায়তুল মালের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, উত্তরাধিকা বা মীরাসী আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন, ইসলামী শ্রমনীতির রূপদান প্রভৃতি অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণ সম্ভব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তখন তাঁর সামনে কোন মডেল ছিল না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে মডেল তৈরীতে সাহায্য করলেন জীবরীল এর মাধ্যমে নির্দেশ পাঠিয়ে। সেই আলোকে তিনি গড়ে তুললেন নতুন এক সমাজ কাঠামো, অর্থনীতি ছিল যার অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। তিনি ঠিক করে দিলেন অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে অবশ্যই নজরদারী করতে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে। আবার প্রয়োজন পূর্ণ সহযোগিতা নিয়েও এগিয়ে আসতে হবে।

অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মধ্যে এমন কতগুলি বিষয় রয়েছে যা ব্যক্তির হাতে ছেড়ে দেওয়া উত্তম, কিন্তু তার লাগাম রাষ্ট্রের হাতে থাকাই বাঞ্চনীয়। যেমন উৎপাদন, বন্টন ও বিনিয়োগ। এগুলির যথাযথ তত্ত্বাবধান না হলে সমাজে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য বৃদ্ধি পাবে, মুষ্টিমেয় লোকেই সকল সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ফেলবে। ফলে সাধারণ মানুষের দুর্গতির অন্ত রইবে না। মূলত : এই দৃষ্টিকোণ হতেই মানবতার অকৃতিম দরদী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উৎপাদের পাশাপাশি তা থেকে গরীবদের হক আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন, ইয়াতীমদের যত্ন নিতে বলেছেন। তিনি ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণের জন্যে পৃথক দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কৃষি জমি অনাবদী ফেলে রাখার বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন।

আলোচ্য প্রসঙ্গে যে বিশেষ ক্ষেত্রেগুলিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন তার কারণ ও ফলাফল পর্যালোচনা করা দরকার। সেগুলি হচ্ছে-

১। উপার্জন
২। কৃষি

৩। শিল্প ও শ্রমিক এবং
৪। ব্যবসা-বাণিজ্য

উপার্জন : ইসলামী রাষ্ট্র অবশ্যই ব্যক্তির উপার্জনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। উপার্জনের পথ ও পদ্ধতি হালাল বা বৈধ হতে হবে। অবৈধ উপায়ে অর্জিত সমস্ত সম্পদ ইসলামী সরকার বাজেয়াপ্ত করে নেবে। কেননা সব অবৈধ পন্থাই হচ্ছে হারাম বা মুনকার এবং মুনকার নির্মূল করা ইসলামী সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। সরকার সুদ, ঘুষ, জুয়া,কালোবাজারী, মজুতদারী, চোরাকারবারী ইত্যাদি সকল হারাম উপায়ে উপার্জনের পথ রুদ্ধ করে দেবে। সরকার এজন্যে আইনের কঠোর ও ত্বরিৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। অপরদিকে যদি অন্যের জমি, সম্পত্তি বা অর্থে কেউ জোর-জবরদস্তিমূলকভাবে আত্মসাৎ করে থাকে তবে তা উদ্ধার করে প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেবে। তা সম্ভব না হলে ঐ ধন-সম্পদ বায়তুলমালে জমা হবে। এমনকি কোন শাসনকর্তা বা সরকারী কর্মচারী পদের সুযোগ নিয়ে বিত্ত-সম্পত্তি করলে তাও সরকার বাজেয়াপ্ত করতে পারেন। যদি এ কাজ না করা হয়, তবে সমাজে দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার অব্যাহত থাকবে। পরিণামে তা রাষ্ট্র ও সমাজের অকল্যাণ ও মারাত্মক দুর্গতি ডেকে আনবে।

কৃষি : কৃষির স্বার্থে বর্গাচাষের শর্ত ও পদ্ধতির কারণে কৃষক যেন অত্যাচারিত না হয় সে বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবিশেষ সতর্ক থাকতে বলেছেন। উপরন্তু জমি যেন অনাবাদী ও পতিত পড়ে না থাকে সে ব্যবস্থা করা সকরকারেই দায়িত্ব। জমির উৎপাদন ক্ষমতা, পরিমাণ ও গুণাগুণের ভিত্তিতে খারাজ নির্ধারণ করা হবে। ট্যাক্স জনগণের জন্যে দুর্বিষহ ভারের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে কিনা তাও যাচাই করে দেখতে হবে সরকারকেই। কৃষির প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে কৃষককে সাহায্য করা দরকার। কৃষিপণ্যের বাজার, মূল্য ও সরবরাহের উপরও সরকারের নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে তেমনি কৃষকও তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায়সঙ্গত দাম হতে বঞ্চিত হবে। তাছাড়া মূল্য বেড়ে গিয়ে জনগণের ও অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে।

সরকারের অপর অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে মীরাস বা উত্তরাধিকার আইনের যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে কিনা তা লক্ষ্য করা। বিশেষত :ইয়াতীম ও স্ত্রীলোক এই বিধানের সুফল পাচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে। বর্তমানে সমাজে ন্যায্য প্রাপ্য হতে ওয়ারিশরা প্রায়ই বঞ্চিত হয়। সৎভাই-বোনেরা বিতাড়িত হয়। এর কারণ মীরাসী আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগের অভাব। এ ব্যাপারে সরকারকে অবশ্যই কঠোর হতে হবে। পক্ষপাতহীন শাস্তি প্রয়োগের মাধ্যমেই এই দুর্নীতি দমনে করা সম্ভব। অসিয়ত ও ওয়াকফকৃত জমি যেন সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে সরকারকেই।

শ্রমিক : রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশের প্রেক্ষিতে একথা বুঝতে বাকী থাকার কথা নয় যে, ইসলামী সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায় নিশ্চিত করা। তাদের উপর যাতে জুলুম না হতে পারে তার যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। শ্রমিকদের মজুরী যেন তাদের জীবন-যাপনের জন্যে উপযুক্ত হয় তা দেখাও সরকারে দায়িত্ব। শ্রমিকদের জন্য সরকার একটা নিন্মতম মজুরী নির্ধারণ করে দেবে। শিল্পমালিকেরা এই মজুরী দিতে বাধ্য থাকবে। বাস্তবতার আলোকেই সরকার শ্রমিকদের অন্যান্য সুবিধা দানের ব্যবস্থা সম্বলিত আইন প্রণয়ন করবে। শ্রমিকদের নায্য অধিকার সংরক্ষণ, বাসস্থান, চিকিৎসা, বোনাস ইত্যাদির সুবিধাও এই আইনে থাকবে। এসব আইনের উদ্দেশ্যে হবে শ্রমিকদের সত্যিকার স্বার্থ রক্ষা করা।

ব্যবসা-বাণিজ্য : ব্যবসায়ের সব অবৈধ ও অন্যায় পথ এবং প্রতারণামূলক কাজ নিষিদ্ধ করাই শুধু ইসলামী সরকারের দায়িত্ব নয় বরং তা যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তাও দেখা কর্তব্য। ইহতিকার অর্থাৎ অধিক লাভের আশায় পণ্য মজুদ রাখা ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্য অপরাধ। ওজনে কারচুপিও

তাই। এ সমস্তই প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। না হলে জনসাধারণ ক্রমাগত ঠকতে থাকবে। এর প্রতিবিধানের জন্যে হিসবাহ নামে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান কায়েম হয়েছিল। এ থেকেই উপলব্ধি করা যায় সমাজকে তথা মানব চরিত্রকে কত গভীলভাবে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যবেক্ষণ করেছিলেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাঝে মাঝে বাজার পরিদর্শনে যেতেন। রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময়ে দোকানদারদের কার্যক্রম লক্ষ্য করতেন। এ থেকেই বোঝা যায় বাজার ব্যবস্থার উপর সার্বক্ষণিক নজর রাখা সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্যও বটে। পরবর্তীকালে আমীরুল মুমিনীন উমর (রা) একাজ করতেন। এর উদ্দেশ্যে হচ্ছে বাজার যেন স্বাভাবিক নিয়মে চলে। মজুতদারী, মুনাফাখারী, ওজনে কারচুপি, ভেজাল দেওয়া, নকল করা প্রভৃতি বাজারে অনুপ্রবেশের সুযোগ না পায়। পন্যসামগ্রীর অভ্যন্তরীণ চলাচলের উপর বিধি-নিষেধও সম্ভবপর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ তুলে নিতে হবে। কারণ, খাদ্যদ্রব্য ও প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর অবাধ চলাচলের উপর বাধা-নিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ আরোপের ফলেই কৃত্রিম সংকটের সৃষ্টি হয় ও দুর্নীতির পথ প্রশস্ত হয়। তাই বাজার নিয়ন্ত্রণ ও দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক করার জন্যে সরকারকে সুষ্ঠু ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

যে কোন উত্তম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিচায়ক হচ্ছে তার সামাজিক কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্যে গৃহীত ব্যবস্থা। প্রচলিত সমস্ত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শে এজন্যেই সমাজকল্যাণের কথা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সে সবের কোনটিই ইসলামের সমকক্ষ নয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলামেই জনকল্যাণের জন্যে সর্বপ্রথম সর্বাত্মক জোর ও সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে শুধু আল-কুরআনে ও হাদীস শরীফে যে নির্দেশ রয়েছে তার যথাযথ প্রয়োগ করতে পারলে গোটা সমাজব্যবস্থায় এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হওয়া সম্ভবপর। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আপন আপন মর্জি-মাফিক যতটুকু করতে ইচ্ছুক ততটুকুই মাত্র জনসাধারণ পেতে পারে। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রে একদলীয় সরকারের নিজস্ব নীতি ও প্রয়োজন অনুসারে জনকল্যাণমূলক নীতি গৃহীত হয়ে থাকে। এর কোনটিই পূর্ণাংগ ও সুষ্ঠ হতে পারে না।

জনকল্যাণের জন্যে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য ছাড়াও ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। ব্যক্তিকেও নিজস্ব সামর্থ ও যোগ্যতা অনুযায়ী এগিয়ে আসতে হবে। ব্যক্তির ধন-সম্পত্তিতে অন্যেরও হক বা অধিকার রয়েছে। আল-কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে-

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

তুমি আত্মীয় স্বজন ও গরীব এবং পথের কাঙালগণকে তাদের পাওনা দিয়ে দাও।
(সূরা বনি ইসরাইল : ২৬ আয়াত)

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-
তোমাদের ধন সম্পদে যাকাত ছাড়াও দরিদ্রদের অধিকার রয়েছে।
(তিরমিযী)

উপরের আয়াত ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, কোন ব্যক্তির উপার্জিত অর্থে তার নিজের ছাড়াও আত্মীয়-স্বজন ও সমাজের অন্যান্য অভাবগ্রস্তদের অধিকার রয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের অধিকারী হয় এবং তার আত্মীয়দের মধ্যে কেউ প্রয়োজনের চেয়ে কম উপার্জন করে তাহলে সামর্থ্য অনুযায়ী ঐ আত্মীয়কে সাহায্য করা তার সামাজিক দায়িত্ব। আত্মীয়দের মধ্যে কেউ এমন না থাকলে প্রতিবেশী বা পরিচিতদের মধ্যে অভাবগ্রস্ত বা প্রয়োজন পূরণে অক্ষম ব্যক্তিকে

সাহায্য করা ঐ ব্যক্তির পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। এমন ব্যাপকভাবে প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নির্দেশ পৃথিবীর আর কোন ধর্মে বা মতাদর্শে ইসলামের পূর্বেও দেওয়া হয়নি, পরেও না। বস্তুত: এই নির্দেশের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য, সহযোগিতা ও সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব অনুভূতির প্রেরণা রয়েছে।

জনকল্যাণমূলক কাজের উদ্দেশ্যে ও সমাজের সাধারণ মানুষের আর্থিক নিরাপত্তা বিধানের জন্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুটি বলিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন- যাকাত ও বায়তুলমাল। যাকাত কারা দেবে, কিভাবে তা আদায় হবে এবং কারা যাকাতের হকদার সে সম্পর্কে ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে বায়তুল মাল সৃষ্টির উদ্দেশ্য, এর অর্থের উৎস ও ব্যয়ের খাত প্রভৃতি সম্বন্ধেও বলা হয়েছে। ইসলামী সমাজে বায়তুলমাল ও যাকাত একযোগে যে বিপুল সামাজিক কল্যাণমূলক কাজ করতে পারে এবং দু:স্থ, দারিদ্রপীড়িত, অক্ষম, বৃদ্ধ, পঙ্গু, বিধবা ও ইয়াতীম শিশুদের যে আর্থিক নিরাপত্তা দিতে পারে তা আর কোনভাবেই সম্ভব নয়। ইসলাম পূর্ব যুগের কোন সমাজে তা ছিল না, এখনও নেই।

রাষ্ট্রীয় প্রশাসন লোক ঢোকানোর জন্যে সমস্যার সাময়িক উপশম করতে পারে বটে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী কল্যাণ সাধন হয় না। স্বেচ্ছায় মানুষ যখন কোন কাজে সাড়া দেয় এবং অংশ গ্রহণ করে তখন যে দুর্বার শক্তির সৃষ্টি হয় তার মুখে কোন বাধাই যেমন বাধা নয়, তেমনি কোন কাজই কঠিন নয়। যাকাত ও বায়তুলমাল ছাড়াও মীরাসী আইনের প্রয়োগ, মানবিক শ্রমনীতির প্রবর্তন, সম্পত্তিতে নারীরা অধিকারের প্রতিষ্ঠা, করযে হাসানার বিধান এবং উপার্জন ভোগ-বন্টন প্রভৃতি ক্ষেত্রে হালাল-হারামের পার্থক্য নির্দেশ একদিকে বহু সামাজিক অনাচারের পথ যেমন চিরতরে রুদ্ধ করে দিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি মানবীয় গুণাবলীর বিকাশ ও জনসাধারণের দীর্ঘ মেয়াদী কল্যাণ ও উন্নয়নের পথ সুগম করেছে। বস্তুত : উপরোক্ত বিষয়গুলির সমষ্টিফলই হচ্ছে একটি সুখী, অভাবমুক্ত ও সমৃদ্ধশালী সমাজ। আইয়ামে জাহেলিয়াত ও তার পূর্ববর্তী সমাজ ব্যবস্থাসমূহ হতে ক্রমে ক্রমে যে পংকিলতা ও অনাচার অর্থনীতিতে সংক্রমিত হয়েছিল সেসব দূর করার জন্যেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশিত পথে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাজ করে গেছেন। তাঁর সে পথ অনুসরণ করেছেন মহান খুলাফায়ে রাশেদীন (রা)। ফলে অর্থনীতিতে সূচিত হয়েছিল বিপ্লব। প্রয়োগ ও সাফল্যে সৃষ্টি হয়েছিল উন্নয়নের গতিবেগ। তারই সুদূরপ্রসারী ফল হিসেবে এক সুখী ও সমৃদ্ধশালী, সাহিত্য-শিল্পকলা ও বিজ্ঞানে উন্নত সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল।

উপরের আলোচনা হতে একথা পরিস্কার হয়ে গেছে যে মানবতার বন্ধু, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী এবং সফলতম সমাজ সংস্কারক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাত্র দশ বছরের প্রচেষ্টায় সমকালীন অর্থনীতিতে এমন পরিবর্তন এনেছিলেন যা ছিল এক কথায় অনন্য। তিনি অর্থনীতিতে এমন পরিবর্তন এনেছিলেন যা ছিল অশ্রুতপূর্ব। এই কর্মসূচীর মাধ্যমেই মাধ্যমেই তিনি একদিকে অত্যাচার ও শোষণের পথ রুদ্ধ করেছিলেন। দাসভিত্তিক অর্থনীতির মূলে তিনি কুঠারাঘাত করেছেন, বিলাসিতা ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবন উৎখাত করেছেন, অবৈধ পথে উপার্জনের মাধ্যমে বিপুল বিত্তের মালিক হয়ে সাধারণ লোকের উপর ছড়ি ঘোরাবার পথ রুদ্ধ করেছেন, সুদের মত ঘৃণ্য প্রথার মাধ্যমে জোঁকের মত সমাজদেহ হতে জীবনীশকক্তি শুষে নেবার পথ ধ্বংস করেছেন। এরই পাশাপাশি যাকাত ব্যবস্থা বাস্তবায়ন, প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার, বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিটি নাগরিকের আর্থিক নিরাপত্তা ও কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধান করে আপামর জনসাধারণের জীবনে যে স্বস্তি ও নিরাপত্তা বিধান করেছেন সমকালীন বিশ্ব ইতিহাসে তার তূল্য কোন নজীর নেই।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, নবী মুসা (আ) আল্লাহর সংগে তুর পাহাড়ে সাক্ষাৎ করতে গেলে তাঁর কাছ থেকে দশ দফা নির্দেশ পেয়েছিলেন। খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে এই দশ দফা নির্দেশ বা Ten Commandments এর উল্লেখ রয়েছে। এরপর দীর্ঘ সময় পরিক্রমায় নানা জনে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ-প্রভৃতি ক্ষেত্রে নানা ধরণের কর্মসূচী দিয়েছেন, সমাজ জীবনে কোন না কোন দিকের সংস্কার বা উন্নয়নের জন্য দিয়েছেন নানা দফা বা দিক নির্দেশনামূলক প্রস্তাব। পৃথিবীর বহু রাজনীতিবীদ, সমাজ সংস্কারক, অর্থনীতিবিদ তাদের প্রস্তাবিত দফার সাফল্য জীবদ্দশায় দেখে যাওয়া দুরে থাক সেসবের বাস্তবায়ন পর্যন্ত করে যেতে পারেননি। কিন্তু আল্লাহর হাবীব ছিলেন পৃথিবীর সকল কালের সকল মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সফল রাষ্ট্রনেতাও সমাজ সংস্কারক। তিনি যে দশ দফা কর্মসূচীর ঘোষণা দিয়েছিলেন তা বাস্তবায়নও করে দেখিয়েছেন। এখানেই তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব, তাঁর অসাধারণ সাফল্য।

বিশ্বের বঞ্চিত নির্যাতিত মানুষ তাঁর গৃহীত অর্থনৈতিক কর্মসূচীর মাধ্যমে যে শোষণমুক্ত নবজীবন লাভ করেছিল, have nots আর have দের যের দূরতিক্রম্য ব্যবধান অপসারিত হয়েছিল, রাষ্ট্রেরই পক্ষপুটে অসহায়দের আশ্রয়ের যে অভাবিত সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল পৃথিবীর আর কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতেই তার কোন নজীর নেই। পরিতাপের বিষয় আজকের মুসলমান আত্মভোলা, নিজেদের ইতিহাস বিস্মৃত। সে বিজাতীয় জীবনাদর্শ ও কর্মকৌশল আকঁড়ে ধরে ভুল পথে উন্নতি লাভের চেষ্টা করছে। ফলে না তার ইহজাগতিক উন্নতি হচ্ছে, না তার আখিরাতের জীবনের কল্যাণ হচ্ছে। এই অবস্থা হতে পরিমাণ পেতে হলে নিজেদের স্বকীয়তা নিয়ে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হবে, সামনে এগুবার জন্যে সংকল্পবদ্ধ হতে হবে। রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমেই তার পক্ষে সম্ভব ইহজাগতিক কল্যাণ একমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদর্শিত জীবন ব্যবস্তা অনুসরণেই তার মুক্তি এই বোধ-বিশ্বাসে তাকে উজ্জীবিত হতে হবে। তবেই ইহকালীন সাফল্যের সাথে নিশ্চিত হবে তার পারলৌকিক মুক্তি।

সমাপ্ত